ফিলিস্তিন মুক্তি-সংগ্রাম

ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রাম

গ্রন্থনায় ঃ

নজমুল হক

ও

আবদুস সালাম

সম্পাদনায় ঃ

কাজী শামসুল হক

প্রবাল প্রকাশন, ঢাকা

প্রকাশক :

আবদুস সালাম

প্রবাল প্রকাশন

৪০/৪১, জিন্দাবাহার ১ম লেন

ঢাকা-১

প্রচ্ছদ শিল্পী : মোঃ মাসুদ আলী

মানচিত্র অঙ্কনে : আবদুল বাকী

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৭৬ ইং

পরিবেশক :

বই বিনিময় লিঃ

৩৩, পাটুয়াটুলী

ঢাকা-১

(সর্বস্বত্ব প্রকাশকের)

মুদ্রাকর :

কাজী শামসুল হক

প্রিন্টোগ্রাফিক

৩৩, পাটুয়াটুলী

ঢাকা-১

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ভূমিকা	/০
২।	আরব জনতার সংগ্রামী ইতিহাস ...	৫
৩।	ফিলিস্তিনঃ রাষ্ট্রিক স্বরূপ	১৬
৪।	ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের আলেখ্য	২৬
৫।	প্যালেষ্টাইনী জনতার অগ্রদূত ইয়াসির আরাফাত ...	৩৪
৬।	চিরঞ্জীব বাদশাহ ফয়সল	৫৭
৭।	মোয়াম্মার গাদ্দাফী	৬৩
৮।	লায়লার হাইজ্যাক যুদ্ধ	৬৮

ভূমিকা

ইজরেল হলো একটি মূর্ত্তিমান অপরাধ এবং এই অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধই হলো প্যালেষ্টাইন মুক্তিসংগ্রাম। "রাষ্ট্র" হিসেবে ইজরেলের জন্ম তথা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধের ক্রমান্বয় পুঞ্জীভবন ও রূপ লাভের কাহিনীটি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ যতেষ্ট ধারণা তথা বর্তমান প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রামের প্রায় শতাব্দীব্যাপী পটভূমিকা জানা না থাকলে এই মুক্তি সংগ্রামের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন ও তার ন্যায্য মূল্যায়ন সম্ভব নয়। প্যালেষ্টাইন মুক্তিসংগ্রামের সমর্থন অথবা বিরোধিতা করতে হবে আবেগগত কারণে নয়, তা করতে হবে নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ বুদ্ধি বৃত্তিক বিচারের ভিত্তিতে। আর এইরূপ একটি বিচারের জন্যই 'রাষ্ট্র' হিসেবে ইজরেলের বেআইনী জন্মের কাহিনীর কিছুটা আলোচনা দরকার।

সাধারণতঃ দুটো আন্তর্জাতিক দলীলকে ইজরেলের শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি তথা বৈধতার প্রমাণপত্ররূপে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে; (১) ব্যালফোর ঘোষণা, ২রা নভেম্বর ১৯১৭ সন এবং (২) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব,……১৯৪৭ সন। দুটো দলীলের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে ন্যায়নীতি ভিত্তিক এক মহত্ত্বের আমেজ; বৃটেনের ব্যালফোর ঘোষণা আসে এমন এক সময় যখন একটি বিকট বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা তথা ন্যায়নীতির স্বপক্ষে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করছে বৃটেন—এইভাবে যুদ্ধ করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা তথা ন্যায়নীতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে সে। ন্যায়যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ন্যায়নীতির এই অদম্য ও অজেয় প্রতীকের কাছ থেকে একটি নির্যাতিত জাতির জন্য আশ্রয় সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিমূলক ঘোষণাটির সঙ্গে তাই সাধারণভাবে একটি অতিমহত্ত্ব, একটি সন্তসুলভ ন্যায়যুদ্ধের গন্ধ মাখা বলে মনে হয়। আবেগিত কারণে মুসলমানদের ছাড়া আর

কাম্মোই এর প্রতি বিরোধিতা দূরে থাক অশ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করাটাও তাই, সাধারণভাবে স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই ব্যালফোর ঘোষণাকে স্বীয় শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরে ইজরেলে মুসলিম বিশ্বের বাইরে একটি স্বাভাবিক সহানুভূতি জয় করে ফেলতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দলীলটি যেন ইজরেলের বৈধতার প্রশ্নে বাদবাকী কোন সন্দেহ থাকলে তারও নিষ্পত্তি করে; ১৯৪৫ সনে, নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে মরণপন ন্যায়যুদ্ধে বিজয়ী মানবতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের দ্বারা, শান্তি ও আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির অভিভাবকরূপে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বব্যাপী একটি বিশেষ সমীহা, সম্মান ও আস্থার পাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাতি সংঘের প্রতি বিশ্ব সমাজের আস্থা ক্ষয়ের সূচনা '৪৭/'৪৮ এ তখনও ঘটেনি। এমতাবস্থায় জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ডান বাম উভয় পক্ষের সমর্থনে যেই প্রস্তাব পাশ হয়, তার বৈধতা ও ন্যায্যতা সম্পর্কেও সাধারণভাবে বিশ্বব্যাপী আস্থাটা ছিল অতি স্বাভাবিক।

এই ভাবে একটি মেকী আমেজ বা "ইমেজের" সুবিধা নিয়ে ইজরেলের "শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি" বা "বৈধতার প্রমাণপত্র" সমূহ তারজন্য একটি অন্যায় অথচ স্বাভাবিক আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। প্রায় আবেগগত কারণেই শুধু, একমাত্র মুসলিম বিশ্ব ছাড়া চাই পুঁজিবাদী, চাই কি সমাজতন্ত্রী—চাই উত্তরের উন্নত বিশ্ব। চাইকি মুসলিম জগতের বহির্ভূত তৃতীয় বিশ্বের বাদবাকী অংশ এমনকি আফ্রিকার বহু অমুসলিম শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রই ইজরেলের পক্ষ নিতে থাকে। তুরস্ক ও ইরানের মত মুসলিম রাষ্ট্রও ইজরেলের সহযোগিতায় ব্যাপৃত হয়। কারণ ছিল এই যে, ইজরেলের বিপক্ষে টানার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক আইনগত যুক্তিসমূহের অবতারণা না করতে পারায় ঐ কাজ যেখানে হচ্ছিল একমাত্র আবেগকে মূলধন করে, সেখানে ইরান ও তুরস্কের ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় আবেগ ঐতিহাসিক কারণেই, ইজরেল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলোতে আরব

প্যালেষ্টাইনীদের পক্ষে না ছিল যতখানি, তার চাইতে অধিক ছিল বিপক্ষে। ইরান আর তুরস্ক তখন নিজ নিজ জাতীয়তাবাদে প্রায় নবদীক্ষিতই শুধু নয়, আরব জাতীয়তাবাদী ঘৃণার ফলে রীতিমত প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্তও বটে। ইরানের ক্ষেত্রে যেই ধর্মগত আবেগসম্ভূত কারণে প্যালেষ্টাইনীয়দের প্রতি তার সমর্থন থাকবার কথা প্যালেষ্টাইনীয়দের সঙ্গে তার সেই ধর্মগত ঐক্যই ছিল অন্যসকল মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় শিথিলতম। শিয়া ও পারসিক ইরানের পক্ষে ছুন্নী আরব প্যালেষ্টানীয়দের নিকটবর্ত্তী হওয়া অন্য সকল মুসলিম রাষ্ট্রের চাইতে অধিক কঠিন।

ইজরেলের জন্মের পরপরই তার প্রতি এই যে একটি স্বাভাবিক বিশ্বজনীন সহানুভূতি তার দিকে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি সত্তুরের দশক আসবার আগ পর্যন্তও প্যালেষ্টাইন সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আরব বিশ্ব ও তার বাইরে দুয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের ভেতরই সীমিত ছিল। আফ্রিকার বহুসংখ্যক দেশ আজও ইজরেলের সঙ্গে অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯১৭ এবং বিশেষ করে ১৯৭৩-এর মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ। তেল সংকট, কাঁচামাল রপ্তানীকারক ও অনুন্নত দেশসমূহের জোটবদ্ধতাও তাতে আরব রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বগ্রহণ ইত্যাদি কারণেই শুধুমাত্র অতি সম্প্রতি এইসব রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইজরেলের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্যালেষ্টাইন সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সমীহা আরব বিশ্ব ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে অতি উৎসাহী দু'চারটি দেশের গণ্ডির বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

সমর্থন ও সমীহা একটি মনোগত বিষয়। অর্থনৈতিক বা সাময়িক একটি ভাবগত কারণে সৃষ্ট কোন 'সমর্থন' বা 'সমীহা'কে স্থায়ী করে ধরে রাখতে হলে যা প্রয়োজন তা হলো এই সমর্থনের জন্য একটি প্রকৃতই মানসিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। আজ যারা অবস্থার চাপে বা ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সনের যুদ্ধজাত আরবদের প্রতি সাময়িক বা আংশিক আবেগগত সমর্থন দিচ্ছে। তারা যাতে অবস্থার চাপ, অর্থনৈতিক সুবিধার আশা বা যুদ্ধে আরবদের রোমান্টিক বীরত্ব অথবা ইজরেলের আগ্রাসী

নীতিতে ঘৃণার জন্য নয়, বরং প্যালেষ্টাইন সংগ্রামের ন্যায্যতার জন্যই প্যালেষ্টাইন সংগ্রামকে সমর্থন করতে শুরু করে, সেটাই হলো কাম্য। এবং তার জন্য প্রয়োজন, প্যালেষ্টাইন সংগ্রামের ন্যায্যতা, তথা ইজরেলের অবৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

আজকে পাশ্চাত্যের অনেক দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ কমুনিষ্ট বিশ্বের প্রায় সর্বাংশ আরবদের সমর্থন করছে ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রমকে সমর্থন করছে। আরবদের সমর্থন করা বলতে তারা যা বোঝায় তা হলো এই যে তারা ইজরেলের আগ্রাসী নীতির প্রতিকার চায়—কিন্তু খোদ ইজরেলই যে একটি অপরাধ—তার প্রতিকার চায় না। তারা ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ এর যুদ্ধে ইজরেলের যেসব আরবভূমি দখল করে ফেলেছে—যার অধিকাংশই প্যালেষ্টাইনের বহির্ভূত অন্যান্য দেশ যথা মিশরের অংশ—তা থেকে ইজরেলের অপসারণ চায়—কিন্তু সমগ্র প্যালেষ্টাইন থেকে ইজরেলের উৎখাৎ এবং রাষ্ট্র হিসেবে প্যালেষ্টাইনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চায় না।

তারা যদি প্যালেষ্টান মুক্তি সংগ্রামের মুখপাত্রকে জাতিসংঘে কথা বলতে দিয়ে থাকে, তা এই জন্য নয় যে তারা প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রামকে বা তার উদ্দেশ্যকে সমর্থন দিচ্ছে, বরং এই জন্য যে এই কাজটি দ্বারা তারা কেবলমাত্র তাদের আরবপ্রীতির প্রমাণ দিতে চায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে আরবপ্রীতি সবসময়ই যে প্রকৃতপক্ষেই আরবদের সমর্থন হবে, তা নয়। আবার একই ভাবে আরবদের সমর্থন আর প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন ও এক কথা নয়, কেননা আরব ভূমি উদ্ধার ও প্যালেষ্টাইন সমস্যা দুটো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলো দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সমস্যা।

১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সনে ইজরেল যে আরব ভূমি দখল করে নেয়, তা ছিল প্রকাশ্য অবৈধ এবং এইজন্যই বিশ্বব্যাপী বিবেক তার বিরুদ্ধে এত স্বাভাবিক ভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু ১৯৪৮ সনে ইজরেলের প্রতিষ্ঠা জনিত যে অপরাধের প্রতিকারের জন্য প্যালেষ্টাইন মুক্তিসংস্থা সংগ্রামরত, তার অবৈধতা কখনো এত স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়নি বলেই প্যালে-

টাইন মুক্তিসংগ্রাম ও তার উদ্দেশ্য কখনো ঐরকম ব্যাপক সমর্থন পায়নি—আজও প্রকৃত প্রস্তাবে পায় না। ইজরেলের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইন মুক্তি-সংগ্রমের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য তাই নানারূপ কূটনৈতিক চাপ ও ভাবাবেগ গত পরিবেশ স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সবচাইতে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যা করতে হবে, তা হলো ইজরেলের অবৈধতাকে পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যাপক সম্প্রচার। মনে রাখতে হবে ইজরেলের বিরুদ্ধাচরণ বা সমর্থন হতে হবে প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ বুদ্ধিগত, ন্যায়-বিচারের প্রশ্নে—আবেগ বা চাপের মুখে নয়।

পূর্বে ইজরেলের দুটো শাসনতান্ত্রিক ভিত্তির কথা বলেছি—এবং সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে তা যে কি ভাবে গ্রহণযোগ্য ও সহানুভূতির উদ্রেককারী, তাও দেখিয়েছি। কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে দুটো দলীলই অবৈধ এবং এই কারণেই দলীলে দুটো ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইজরেলের আইনগত রাষ্ট্র সত্ত্বাও অবৈধ এবং অনুপস্থিত। অর্থাৎ আইনের চোখে ইজরেল টিকে আছে কোন রাষ্ট্র হিসেবে নয়। "দস্যু সুলভ জবর দখল" ("piracy") হিসেবে। ১৯১৭ সনের ২রা নভেম্বরের ব্যালফোর ঘোষনার বৈধতা আলোচনা করতে হলে তার পটভূমিকার নিরীক্ষা প্রয়োজন। ১৯১৫ সনে ওটোম্যান সাম্রাজ্যের "হোমসের পশ্চিমে অবস্থিত কোন কোন জায়গা" ছাড়া সমস্ত আরবভূমির স্বাধীনতার স্বীকৃতির মাধ্যমেই শুধু বৃটিশেরা আরবদের ওটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করতে পেরেছিল। সমস্ত হোমের পশ্চিমে কিছু কিছু জায়গা (যার অর্থ বর্তমান লেবানন দাঁড়ায়) বাকী সমস্ত আরব ভূমিতে আরব স্বাধীনতার এই বৃটিশ স্বীকৃতি "শরীফ হুসেন—ম্যাকমোহন করেসপণ্ডন্স" নামীয় আন্তর্জাতিক চুক্তিমালায় রীতিমত বিধিবদ্ধ হয়ে ছিল। ১৯১৭ সনের ২রা নভেম্বর ব্যালফোর ঘোষণার মাধ্যমে এই একই জায়গার অন্তর্ভূক্ত প্যালেষ্টাইনে আরবদের সম্মতি ছাড়াই ইহুদীদের জন্য একটি জাতীয় আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠায় সমর্থন বা স্বীকৃতি দিয়ে বৃটেন তার

পূর্ববর্ত্তী চুক্তি লংঘন করে। তাই পরবর্ত্তী এই ঘোষণাটি একটি অবৈধ ঘোষণা। এই অবৈধ দলীলটির ভিত্তিতেই সূচিত হয় বৃটেনের অবৈধ নীতিমালার ছত্রছায়ায় প্যালেষ্টাইনের ইহুদীকরণ তথা রাষ্ট্র হিসেবে ইজরেলের খনীভবণ। ১৯২০ সনে বৃটেন প্যালেষ্টাইনের অছি নিযুক্ত হয়ে এসে তার প্রশাসনের ভার নেয়ার পর থেকেই শুরু হয় তার ইহুদীবাদী প্রতিষ্ঠানের স্বপদে খোদ আরব শর্ত্তাবলীরই অবমাননা।

১৯২০ সনের প্যারিস চুক্তিমালায় প্যালেষ্টাইনকে "ক" শ্রেণীভূক্ত অছি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই শ্রেণীর অছি ভূখণ্ড সমূহকে সার্বভৌম দেশ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়—অছি তদারকী রাষ্ট্র কেবল সেখানকার জনগনের রাষ্ট্র হিসেবে বিকাশ লাভ সহায়তাকল্পে তাদের প্রশাসনের পরামর্শ দান ও তদারকী করবেন—এই ছিল কথা। অছি হবার পর প্যালেষ্টাইনকে একটি দেশ হিসেবে গন্য করবার নানাবিধ নজীরও রয়েছে। প্যালেষ্টাইনের ভিন্ন পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তণ হয়, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্যালেষ্টাইনকে ভিন্ন একটি দেশ হিসেবে সদস্য পদও দেয়া হয়।

কিন্তু বৃটেন রাষ্ট্র হিসাবে প্যালেষ্টাইনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়তা করে প্রশাসনে পরামর্শ দান ও তদারকী করতে গিয়ে যা করে তা হলো প্যালেষ্টাইনী প্রশাসনকে বৃটিশ স্বেচ্ছাচারের অধীনস্থকরণ এবং ঐ পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাচারী নীতি সমূহের প্রণয়ণ পূর্বক একদিকে দেশটির ক্রমশঃই ইহুদীকরণ এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র হিসেবে তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের গতিরোধ। একটি অবৈধ দলীলকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে একটি পরিপূর্ণ অবৈধ পরিকল্পনার মাধ্যমে যে একটি বিশাল অন্যায় সংঘটিত হলো তারই ফলশ্রুতি হলো প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ। এর সমাধান করতে গিয়ে বৃটেন আরো একটি অন্যায় করেঃ অছি তদারকী রাষ্ট্র মাত্রই অছি দেশের দায়িত্ব গ্রহণের সময় এই ব্যাপারে অঙ্গীবদ্ধ হয়েই তা করে যে দেশটিকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রিক বিকাশের পর্যায়ে এনে পরিপূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার দায়িত্ব সে নিচ্ছে। কিন্তু

ঘটেন, প্যালেষ্টাইন যখন তারই অবৈধ নীতিমালার ফলশ্রুতিস্বরূপ উদ্ভূত এক ভয়ংকর গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত, ঠিক সেই সময়ই তার দায়িত্বের প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়ে প্যালেষ্টাইন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। আন্তর্জাতিক আইনের ভাষায় একে "সিভিল ইনাডফারেন্সের" অপরাধের পর্যায়েও ফেলা যায়।

এই বেআইনী কাজের সূত্র ধরেই এইবার স্বয়ং জাতিসংঘই আরো একটি অবৈধ কাজ করে "রাষ্ট্র" হিসেবে ইজরেলের জন্মদান করেন। জাতিসংঘ সনদের ......ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘ শুধু তার সদস্য মাত্রই নয়, পৃথিবীর সকল দেশেরই অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখাতে বাধ্য। ১৯২০ সন থেকেই স্বতন্ত্র ও অবিভক্ত একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নানাভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্যালেষ্টাইনকে ......এর প্রস্তাবের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডি করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ যা করলেন তা একটি অতিনিকৃষ্ট শ্রেণীর চুক্তি লংঘন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ।

এইভাবে অবৈধ দলীল ও তাণ্ডব কার্যক্রম তথা অপরাধের পর অপরাধ স্তূপীকৃত হয়ে তথাকথিত ইজরেল রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এই মূর্তিমান অপরাধের প্রতিকার তথা বিনাশই প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক আইনে সংঘটিত একটি অপরাধের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সমাজের—তার অপরাগতায়, ঐ অপরাধের শিকারের। তাই ইজরেল অপরাধের প্রতিকারে অস্ত্রধারণ করে প্যালেষ্টাইন মুক্তি-সংগ্রাম যা করেছে তা হলো আইনের অধীনে একটি দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হওয়ার শামিল। এবং একমাত্র দায়িত্বশীলতার ভেতরই রয়েছে আন্তর্জাতিক কেন, সর্বপ্রকার অরাজকতা ও নৈরাজ্যের সমাধান।

ইজরেল রাষ্ট্রের বিনাশ বলতে প্যালেষ্টাইনে এসে পৌঁছা লক্ষ্য লক্ষ্য বহিরাগত ইহুদী ও তাদের বংশধরদের বিনাশ বোঝায় না। প্যালেষ্টাইন মুক্তিসংগ্রাম যা চায়, তা' হলো রাষ্ট্র হিসেবে প্যালেষ্টাইনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং তাতে ধর্ম নির্বিশেষে সকল বৈধ অধিবাসীর স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি। এবং এর জন্যই অবৈধ ও অস্বাভাবিক ইজরেল রাষ্ট্রের বিলুপ্তির প্রয়োজন।

প্যালেষ্টাইন মুক্তিসংগ্রামের সংগে এই দেশের পাঠকদের ও কোন পরিষ্কার ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই। জেরুজালেমের পবিত্র নগরীর প্রতি একটি ধর্মীয় ভাবাবেগগত আকর্ষণ এবং মাঝে মাঝে প্যালেষ্টাইনী গেরিলাদের দুঃসাহসী কার্যকলাপের রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ভাসা ভাসা 'ইমেজ' নিয়েই বাঙ্গালীদের প্যালেষ্টাইন তথা প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রাম। একটি সমস্যা, তার সমাধান এবং তৎসম্পর্কিত একটি মহৎ সংগ্রামকে বুঝবার জন্য এবং ভাবাবেগের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তি ও সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে তাকে বিবেক দিয়ে গ্রহণ ও সমর্থন করবার জন্য তা যথেষ্ট নয়।

এই ক্ষেত্রে এই পুস্তকটি বেশ কাজে আসতে পারে। যদিও পুস্তকটি প্যালেষ্টাইন সমস্যার, তার সমাধানের বা প্যালেষ্টাইন মুক্তিসংগ্রামের কোন পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ধারণ করে না, তা সত্ত্বেও তথ্যের প্রাচুর্যে এবং বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখবার বা উপস্থাপন করবার প্রচেষ্টায় এটি যথেষ্ট মূল্যবান। ভবিষ্যতে বিশ্লেষণ ধর্মী এবং আরো গোছানো ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার জন্য এই পুস্তকটি একটি উপযোগী সহায়ক ও অগ্রণী হিসেবে কাজ দেবে, আশা করা যায়।

এবং এই জন্যই পুস্তকটির লেখক এবং প্রকাশক উভয়কেই ধন্যবাদ জানাতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৪ই মে, ১৯৭৬

আহমদ আনিসুর রহমান

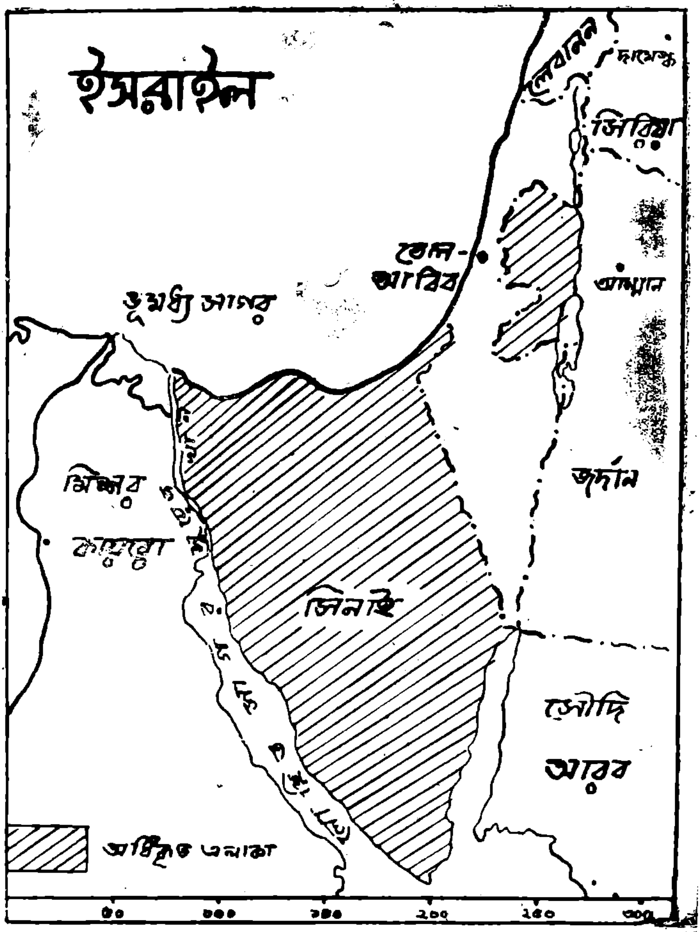
ইসরাইল
লেবানন
দামেস্ক
সিরিয়া
তেল-
আবিব
আম্মান
ভূমধ্য সাগর
মিশর
কায়রো
জর্দান
সিনাই
সৌদি
আরব
অধিকৃত এলাকা

আরব জনতার সংগ্রামী ইতিহাস

ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে তুর্কীরা প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ড দখল করে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে। এর পূর্বেই ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তারা মিসরীয় মামলুক শাসকদের কাছ থেকে প্যালেষ্টাইন দখল করে। এক বছরের মধ্যে মামলুক রাষ্ট্র তাদের হাতেই ধ্বংস হয়। সামন্ততান্ত্রিক ধন আহরণ, বিশ্ব বাণিজ্যের পথগুলো পেয়ে যাওয়া, ভূমধ্যসাগরের বুকে বিশেষ করে উপকূলে আধিপত্য লাভই ছিল এ দখলকারের উদ্দেশ্য। অন্যান্য আরব অঞ্চলের মত প্যালেষ্টাইনেও তুর্কীরা পাশা নামে প্রশাসক বসায়। কিন্তু সুলতানদের বিরুদ্ধে পাশাদের বিদ্রোহ অথবা স্থানীয় আরব সামন্তদের হাতে পাশাদের টালমাটাল অবস্থা, কখনো কখনো কৃষক ও জনবিদ্রোহ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। রাষ্ট্রীয়ভূমি (মামলে কাত), ধর্মীয় ভূমি (ওয়াকফ) আর ব্যক্তি মালিকানার ভূমি (মুল্‌ক) ছিল ভূমিস্বত্বের রীতি। ফসলের এক দশমাংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত ছিল করের আওতায়, অমুসলমানদের জন্য ছিল জিজিয়া কর। ফিলিস্তিনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদি সমষ্টিবদ্ধ সাম্যজীবনের অবশেষ টিকে ছিল তখনো। বেদুঈন ও স্থায়ী বসতির ঐ এলাকাগুলোতেও সামন্ত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শিকড় ছড়াচ্ছিল। ১৭৮৪ সালে লিখিত এক বিবরণী থেকে জানা যায়, দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের ক্ষুদ্র গোত্র-সমাজে পাঁচশ অশ্বারোহীর শেখও ছিলেন। শেখ স্ত্রীয় গোত্রের লোকদের সাথে নিরহঙ্কারে ঘোড়া চরাতেন বলেও জানা যায়। তখন এতদঞ্চলে খৃষ্টানদের মধ্যে ১০টি ও মুসলমানদের মধ্যে ৫টি মতপ্রভেদ ভিত্তিক সম্প্রদায় বসবাস করতো।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের নিদারুণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট দেখা দেয়। উৎপাদিকা ব্যবস্থা বিকাশহীন অবস্থায় নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। সৈন্য যোগাড়েও তার দৈন্য দেখা দেয়। ইউরোপে পরপর সমরকৌশল ও সমরাস্ত্রের উদ্ভবের পাশাপাশি ওসমানীয় সাম্রাজ্যে দেখা দেয় সামরিক শক্তির অবক্ষয়। সমস্ত জায়গীরদার শ্রেণী জানিসারী পাইক পদাতিক দিয়ে সম্রাটের আজ্ঞা পালন করতে অসম্মতি জানাতে শুরু করলে এতদিনের বিজয় আত্মরক্ষার অবস্থানে নেমে আসে।

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে তুর্কীরা পরাজয় বরণ করে। ১৬৯৯ সালে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও ভেনিসের বিরুদ্ধে অভিযান ব্যর্থ হলে কার্লোবিজ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়াকে আজভ, পোল্যাণ্ডকে পোদলিয়া, মধ্য হাঙ্গেরী, ট্রানসালভ্যানিয়া বাকা ও স্লাভনিয়া অষ্ট্রিয়াকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৭৯২ সালের জার্সী চুক্তিতে আরও এলাকা হারায় ওসমানীয়রা। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া আড্রিয়াটিক সাগরও দানিয়ুব অববাহিকা হাত করার চেষ্টা চালায়। ইস্তাম্বুল, মিসর, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, সিরিয়া ও ইরানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স অধীর হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তবে উনিশ শতকে পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদের বিকাশের পর দূরপ্রাচ্য এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবার জন্য পাশ্চাত্য মরীয়া হয়ে উঠে। এটাই উনিশ শতকের ইউরোপীয় কূটনীতির "প্রাচ্য প্রশ্ন।"

১৭৮০ সালের দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয় আরবে। লেবাননে চরম পন্থায় বিদ্রোহ দমন করা হয়। রাজন্যবর্গের একাংশ বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিলে রাজন্যবর্গের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ শুরু হয়। ইউসুফ শিহাব তার ভাইয়ের জিহ্বা কেটে, চক্ষু উৎপাটন করে বিদ্রোহের সাজা দেন। এরপর প্যালেষ্টাইন ও সাঈদার বেদুইন ও কৃষকদের বিদ্রোহ দমন শুরু হয়। এখানেও সামন্তদের একাংশ স্বচ্ছন্দ জীবনের অঙ্গীকার দিয়ে কৃষকদের বিদ্রোহে অবতীর্ণ করেছিল। মিসরকেন্দ্রিক নৃপতি

জাযযার আহমদ চরম নিষ্ঠুরতার সাথে বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত হলে বিদ্রোহও প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। বিদ্রোহীরা বৈরুত, সাঈদা, সুর ও আক্কার উপকণ্ঠ দখল করে নেয়। কিন্তু আহমদের উৎকোচ গ্রহণকারী একদল সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তবু ১৭৯০ সালে আবার লেবাননে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৯৮তে দামেস্কের অধিবাসীরা নিষ্ঠুর আহমদকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিদ্রোহ করে। দামেস্কে নতুন পাশার নিযুক্তিতে বিদ্রোহ থামলেও সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহ চলতে থাকে। ভূমির উপর অধিকার দাবী করে ইরাকে ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্রোহ ঘটে। আবার, গ্রীক, কুর্দ, আর্মেনীয় ও স্লাভদের বিদ্রোহ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র উৎখাত করে মুক্তির চেতনা নিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন হলে তার প্রভাব আরব জগতে এত সহসা এসে উপনীত হবে বলে ভাবা যায়নি। কিন্তু মিসরে সহসাই এর প্রভাব দেখা দিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অধীনে ফরাসী প্রজাতন্ত্র বাহিনী ১৭৯৮ তে মিসর অভিযান করে। ১লা জুলাই ফরাসী বাহিনী আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় হানা দিলে অধিবাসীরা প্রতিরোধ চালায়। প্রতিরোধ চূর্ণ করে ফরাসী বাহিনী মিসর অভিমুখে অগ্রসর হয়। মিসরীয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের বুলির সাথে ঔপনিবেশিক হুমকি এবং সরল জনগণকে ধোকা দেবার জন্য ধর্মীয় ভাবানুভূতি কাজে লাগানোর নাটকীয়তা মিশিয়ে বক্তৃতা করেন।

তার এই ডেমাগগী বক্তৃতার পর নেপোলিয়নের আসল চেহারা তার ৫টি ফরমানে স্পষ্ট : যেমন, বিদ্রোহী গ্রামগুলো পুড়িয়ে দেয়া হবে। তিন ঘণ্টার পথ সমতুল্য দূরত্বের সব গ্রাম থেকে ফরাসী বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিনিধি দল পাঠাতে হবে এবং ত্রিবর্ণ ফরাসী পতাকা তুলতে হবে। বন্ধু ওসমানীয় সুলতানের পতাকাও রাখা যাবে। গ্রামের মোড়ল বা শেখ সামন্তদের সম্পত্তি পাহারা দেবেন। শেখ, উলেমা, ইমামগণ

ওসমানীয় সুলতান, ফরাসী বাহিনীর গৌরব কামনা, মামলুকদের ধ্বংস কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করাবেন।

সামন্ত শ্রেণী ফরাসীদের বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। কারণ সুদক্ষ, উন্নত, সুশৃঙ্খল ফরাসীদের সাথে সামন্ত বাহিনীর পেরে ওঠবার কথা নয়!

কিন্তু হানাদার ফরাসী বাহিনী কায়রো অভিমুখে এগিয়ে এলে সামন্ত ও রাজন্যদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বাইরে কুশলী কারিগর ও সাধারণ মানুষ স্ব-উদ্যোগে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নেয়। তারা স্বেচ্ছাসেবী দল, যোদ্ধা দল গঠন করে অস্ত্র কিনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তবু ফরাসী বাহিনী কায়রোতে ঢুকে পড়ে। নির্মম প্রতিশোধ নেয় প্রতিরোধকারীদের ওপর। এদিকে আগষ্টের প্রথমে ইতালীর এডমিরাল নেলসনের ফরাসী নৌবহর এসে আবুকির উপসাগরে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করে। সুলতান তৃতীয় সেলিম মিসর উদ্ধারের জন্যও যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

জনগণের ধর্মীয় ভাবানুভূতিকে ব্যবহার করতে চেয়ে বোনাপার্ট আলী বোনা বার্দা পাশা নাম নিয়ে, পাগড়ী মাথায় পরে নামাজ আদায়, জেনারেল জ্যাকু ম্যানুকে "আবদুল্লাহ" নামে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস, শেখ ও উলেমাদের নিয়ে দিওয়ান গঠন করে সামন্তদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে ফরাসী উপনিবেশবাদের পক্ষে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্থ ও দ্রব্যে যে করভার ফরাসীরা চাপাতে শুরু করে তার নিরিখেই 'গণবন্ধু' নেপোলিয়নের আসল চেহারা জনগণ সনাক্ত করে নেয়।

তুর্কী সৈন্যরা অভিযান শুরু করতেই বদ্বীপ অঞ্চলগুলোতে ফরাসী সংবাদবাহীদের হালাক করা, ক্ষুদ্র টহলদার দলগুলোকে গায়েব করে দেওয়া, কর সংগ্রাহকদের পিটিয়ে লাশ করা, ফরাসী সামরিক অফিসার-দের অতর্কিতে শিরচ্ছেদ করার মত গেরিলা তৎপরতায় কৃষককুল মেতে উঠে। বদ্বীপ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করতেই কায়রোতে বিদ্রোহ শুরু হয়। অক্টোবরে ফরাসী অফিসার ও জেনারেলদের উপর অতর্কিত গণআক্রমণ শুরু হয়। রাস্তায় গৃহে নিহত হয় একের পর এক। ফরাসী সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। বোনাপার্ট পালিয়ে যান বদ্বীপে।

সেখান থেকে পিটুনী অভিযান চালনার প্রস্তুতি নেন। আল আজহার মসজিদে পনের হাজার লোক সমবেত হয়ে সৈন্যদের গতিরুদ্ধ করার জন্য শুরু করে ব্যারিকেড নির্মাণ। গ্রাম থেকে ৫ হাজার কৃষক, কয়েক হাজার বেদুইন এগিয়ে আসে বোনাপার্টি আসল চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে মসজিদে মসজিদে কামান চালাবার নির্দেশ দেয়। হাজার হাজার লোক হতাহত হয়। আহতদের হত্যা করা হয় বেয়নেট দিয়ে। বিদ্রোহের ৬ জন নেতার শিরচ্ছেদ করে বর্শায় গেথে কায়রোতে ঘুরানো হয়।

সিরিয়া অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফরাসী বাহিনী সরে যাবার জন্য বৃটিশ ও তুরস্কের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু নিরস্ত্র হতে বলা হলে পুনরায় ফরাসীরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এর আগেই, ১৭৯৯ সালেই জেনারেল ক্লোবারের হাতে দায়িত্ব দিয়ে গোপনে নেপোলিয়ন ফিরে গিয়েছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের জুনে আলেপ্পোর সুলেমান নামক ধর্মপ্রাণ এক ব্যক্তি ক্লোবারকে স্বগৃহে হত্যা করে। সামরিক আদালত তাকে হাত পুরিয়ে হত্যা করে। কিন্তু এ যন্ত্রনার মুহুর্তে সুলেমান টুশব্দটি করেননি। এর দাদ নিতে গিয়ে ফরাসী বাহিনী আরেকবার কায়রোতে বহ্ণ্যুৎসব চালায়।

১৮০১ সালে ২০ হাজার বৃটিশ সৈন্য কায়রোতে অবতরণ করে। ফরাসী তিনটি বছরের দখলকারের অবসান ঘটে। এ দখলকারের ব্যর্থতা চরম। কেবল ফরাসী রাজ কর্মচারীরা সেচ, কৃষি, হস্তশিল্প সমাজজীবন, সাংস্কৃতিক সৌধ, সমাজ-সম্পর্ক লোকগীতি, রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার ওপর ২০ খণ্ড বিস্তৃত 'দ্যসক্রিপসন দ্য লা-ইজিপ্টি' রচনা করেছেন—এটাই একমাত্র কাজের মত কাজ। অবশ্য আজও এ গ্রন্থটি থেকে যতেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান আহরিত হয়নি।

তার পর ১৮০১ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত ২০ হাজার বৃটিশ, ৪০ হাজার তুর্ক ও ৪০ হাজার মামলুক সৈন্য কায়রোতে অবস্থান করে। বৃটিশরা যাবার সময় মোহাম্মদ আল আলফী নামক মামলুকপন্থী মিসরীয় নেতাকে বগলদাবা করে নিয়ে যান, যেন যথাসময়ে আবার মিসরের মাটিতে দাঁড় করানো যায়।

তা করুক। প্যালেষ্টাইনের সংবাদ নিতে চাইলে আমরা দেখবো, ফরাসীরা প্যালেষ্টাইনের উপকূলভাগ দখল করেছিল উনিশ শতকের শুরুর দিকে বৃটিশ প্রতিপত্তি বেড়ে যায় আরব অঞ্চলে। পারস্যসাগর ও ইরাকে বৃটিশ শক্তি সংহত হয়ে উঠে।

বর্তমান সউদী আরবের রাজতন্ত্রের পূর্ব প্রতিষ্ঠারা উনিশ শতকের প্রথম দশকে ওসমানীয় আধিপত্য উৎখাত ও আরবের ঐক্য সাধনের লক্ষ্যে অন্যান্য অঞ্চল ছাড়াও পূর্ব প্যালেষ্টাইনের উপর আক্রমণ চালায়।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ওসমানীয় সুলতান রাজকর্মচারীদের পাগড়ী ছেড়ে ফেজটুপী ও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধানের নির্দেশ দিলে ধর্মীয় অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ১৮২৫-এর প্রকালে জীবন যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিদ্রোহে। একই বছর জেরুজালেম কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ১৮৩১-এ মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করলে জনতা তাদের স্বাগত জানায়।

মিসরের বর্ম হিসেবে উপকূল ও পূর্বভাগের প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া হাত করার জন্য মোহাম্মদ আলীর প্রয়াস অব্যাহত থাকে। ১৮৩১ সালে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি এড়াবার জন্য মিসর হতে প্যালেষ্টাইনে পলায়নকারী ছয় সহস্রাধিক কৃষককে কেন্দ্র করেই মোহাম্মদ আলী প্রকারান্তরে তুর্কী মিসর যুদ্ধের আয়োজন করে। একই বছর মিসরীয় সৈন্যরা গাজা, জাফা, হাইফা দখল করে।

অবশেষে সুলতান মিসর, ক্রেটে, আরব ও সুদানের উপর অধিকার স্বীকার করে এবং তাকে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও সিসিলির শাসক নিয়োগ করে এক ফরমান জারী করে মুখ রক্ষা করেন।

আরবী ভাষাভাষী সব অঞ্চলকে একত্রিত করে আরব সাম্রাজ্য গঠণ ছিল মোহাম্মদ আলীর লক্ষ্য। তাঁর পুত্র ইব্রাহিমও অনুরূপ সংস্কার ও প্রসারিত লক্ষ্যে প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

১৮৩৪-এ বৈরুতে ছাপাখানা স্থাপন এই সংস্কারেরই অঙ্গ।

প্যালেষ্টাইনকে ৬টি প্রদেশে বিভক্ত করা এবং নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করাও এর অন্তর্গত। কিন্তু মোহাম্মদ আলী ইব্রাহীমের সৈন্য যোগাতে কৃষকদের অস্বীকৃতি আবার ১৮৩৪-এ বিদ্রোহ ডেকে আনে প্যালেষ্টাইনে। বিদ্রোহীরা ইব্রাহিমকে জেরুজালেমে আটক করে। মোহাম্মদ আলী স্বয়ং পুত্র উদ্ধার ও বিদ্রোহ দমনে নেতৃত্ব দেন। লেবাননেও দেখা দেয় বিদ্রোহ। লেবাননী খৃষ্টান অঞ্চলের সীমিত বিদ্রোহটি ইব্রাহীম দমন করে ফিরবার পর পরই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তথাকথিত 'প্রাচ্য প্রশ্নের' নামে ১৮৪০-এ 'লণ্ডন সম্মেলনের' সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় মোহাম্মদ আলীর উপর। তাতে মোহাম্মদ আলীকে শুধু মিসর ও ফিলিস্তিনের আক্কা রেখে বাকী ভূমি সুলতানকে প্রত্যার্পনের হুকুম এবং ২০ দিনের মধ্যে এ হুকুম তামিল না হলে উৎখাত করার হুমকি দেওয়া হয়! মোহাম্মদ আলী "অস্ত্রের বলে লব্ধ ব্যাপার অস্ত্রবলেই রক্ষার" কথা ঘোষণা করলেন। ফরাসী সাহায্যের প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু ইউরোপীয় যুদ্ধের ঝুকি নিতে ফ্রান্স নারাজ। বৃটিশ রাষ্ট্রীয় রণতরী বহর ও বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের চাপে মোহাম্মদ আলী ও ইব্রাহীম নতি স্বীকার করলেন।

১৮৪০-এর দিক থেকে প্যালেষ্টাইনকে উপনিবেশিকরণের জন্য মিশনারী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এরা প্যালেষ্টাইনে বিদ্যালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে শতগুণ উৎসাহে ধর্মপ্রচার শুরু করে এবং এর মাধ্যমে ধর্মপ্রচারকরা স্ব স্ব দেশের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়! ফ্রান্সের সমর্থনে ভ্যাটিকান এই ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়। ধর্মযুদ্ধের সময়কার লাতিন জেরুজালেম ধর্মসংস্থা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৮৪৯-এ রাশিয়ার অর্থডক্স মিশন জেরুজালেমে আসর পাতে। বৃটেনের ইঙ্গিতে ১৮৪১-এ জার্মানীর মাধ্যমে ইঙ্গ-জার্মান ধর্মগোত্রের একটি মিশন খোলা হয়। প্রকারান্তরে বৃটেন এখানে ইহুদীদের বসতি স্থাপন ও ইহুদী কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ যোগায়। ১৯ শতকের মাঝামাঝি প্যালেষ্টাইনে ইহুদী অধিবাসী সংখ্যা দাড়ায় ১১ হাজার। অনেকেই ছিল তীর্থে

আগত। এদের অনেকেই শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে বসতি স্থাপন করে। ১৮৩৯-৪১ এর তথাকথিত প্রাচ্য সঙ্কটের সময় ব্রিটিশ জেরুজালেমে ইহুদীরাষ্ট্র গঠনের জন্য বোনাপার্টের পরিকল্পনা অনুসরণ করে।

১৮৩৮ সালে প্যালেষ্টাইনে নিযুক্ত ব্রিটিশ কন্সাল গার্ড শ্যাকটবারী ও গাউলার সেখানে ইহুদী জনসংখ্যা স্থানান্তর করে ব্রিটিশ ছত্র-ছায়ায় ইহুদী রাষ্ট্রগঠনের জন্য পরিকল্পনা পাশ করে। ইহুদী ধনকুবের রথচাইল্ড পরিবারভুক্ত ব্রিটিশ ব্যাঙ্কার স্যার মুসা মণ্টেকিওর এ পরি-কল্পনা সমর্থন করে কয়েকবার প্রাচ্য সফরে আসেন এবং ১৮৫৫ সালে জাফায় কমলালেবুর বাগান খরিদ করেন। তবু কোন ইহুদী উপনি-বেশবাদীকে আগ্রহান্বিত তিনি করতে পারেননি।

১৯০৬ সাল নাগাদ ব্রিটেন প্যালেষ্টাইনকে দখল করে নিতে চেষ্টা করে। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ কালে ইতিপূর্বে হস্তগত সুয়েজখাল রক্ষার জন্য একে যুদ্ধঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে মনস্থ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে প্যালেষ্টাইন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে ইতিমধ্যে বিংশ শতকের শুরুর দিকে, প্যালেষ্টাইন ব্রিটিশ প্রভাবে পড়ে। ইতিপূর্বেই মিসর ব্রিটিশ দখলকারে চলে যায়, পূর্ব সুদানে কায়েম হয় মাহদী রাষ্ট্র। আলজিরিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় মুক্তি সংগ্রামে। মরক্কো তখনো ফরাসীদের অধীনে। ইতালীয়রা দখল করেছিল সিরিয়া।

তবে ব্রিটিশ ও ফরাসীরাও কেবল নয়। জার্মানীরাও প্যালেষ্টা-ইনে তাদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে। জাফা থেকে প্যালেষ্টাইন পর্যন্ত ফরাসীরাও রেলপথ খোলে। তাউরাস পর্বতমালার বিপুল খনিজ সম্পদের ব্যাপারে বিদেশীরা সচেতন হয়ে উঠে।

পতনোন্মুখ ওসমানীয় সাম্রাজ্য কেন্দ্রে নব্য তুর্কীরা ক্ষমতা নিয়ে সংস্কারের চেষ্টা চালায়। আরবদের সাথে কথিত ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্কের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু জাতিসত্তাগুলোর প্রতি শাসকসুলভ মনোভাব

সে প্রয়াস ব্যর্থ করে। ১৯১২ সালে প্রথম বলকান যুদ্ধের পর আরব জাতীয়তাবাদীরা ওসমানীয় প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ পার্টি গঠন করে। প্যালেষ্টাইনেও তার শাখা গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকের শেষ ৩০ বছর আরব উপদ্বীপ ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যগুলো কখনো তুরস্কের কখনো বৃটেনের প্রভাব বশে লালিত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মধ্যযুগীয় জীবন এবং যোগাযোগ সমৃদ্ধ অঞ্চলে অবিকশিত স্থবির অর্থনীতির জীবন ব্যবস্থা চলে এসেছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে আরব দেশগুলো পুনরায় বিশ্বরাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পতিত হলো। বৃটেন আরব উপদ্বীপ জুড়ে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজেদের অধিকার কায়েমের জন্য বাধা দেয় বৃটেনকে। তুরস্ক আরব অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব সংহত করার জন্যও চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৮৯৬-এ সুয়েজখালের উদ্বোধনে এ অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এডেনও গুরুত্ব লাভ করে। বৃটেন এডেনকে শুল্ক মুক্ত বন্দর বলেও ঘোষণা করে। সুয়েজখাল খুলবার পর বৃটেন দক্ষিণ আরবকে রক্তস্নাত করে, বোমাবর্ষণ করে শহর গ্রামের উপর, সামন্ত শ্রেণীকে উৎকোচ দিয়ে বশে আনে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে বৃটিশ দক্ষিণ আরবের ২৩টি ক্ষুদ্র সুলতানাৎ ও শেখ রাজ্যকে চুক্তিতে আবদ্ধ করে এবং এডেন কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃটেন পারস্য উপসাগর করায়ত্ত করে। সউদীরা সউদী আরবের প্রতিষ্ঠা ঘটায় ১৯০৬ সালের দিকে।

১৯১৪ সালে আরব দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শিকারে পরিণত হয়। জার্মান-তুর্ক পক্ষ প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন ও আরব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তি নিজেদের স্বার্থে লাগাতে শুরু করে। সিরিয়াও প্যালেষ্টাইনে ৪র্থ বাহিনী এনে বসানো হয়। প্যালেষ্টাইনের অর্থনীতি তখন এহেন যুদ্ধের চাপ সহ্য করতে অপারগ। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে লেবানন, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনব্যাপী প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে

শহরগুলো উজার হয়ে যায়। একমাত্র লেবাননেই ১ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে।

১৯১৫ সালের দিকে জামাল পাশা যখন বুঝলেন যে, জেহাদের শ্লোগানে কাজ হবার নয়, তখন তুর্ক বিরোধী আরব জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান প্রস্তুতি এগিয়ে গেছে অনেকখানি। ইতিপূর্বে ফরাসী দূতাবাসে তল্লাসী চালিয়ে জামাল পাশা এর যথাযথ প্রমাণও পেয়েছিলেন।

তারপর শুরু হলো আরব জাতীয়তাবাদী দলন। পত্র পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা, আরব জাতীয় সমিতিগুলোর লোকজন পাইকারী ভাবে গ্রেফতার এবং সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করা শুরু হলো। সামরিক ট্রাইব্যুনাল বিকেন্দ্রীকরণ পার্টি, তরুণ আরব জোট, লেবাননী জাগরণী সংস্থা সহ বিভিন্ন সংগঠনের ৮০০ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দেয়ার হুকুম দেয়। প্যালেষ্টাইনী অনেককেও সে দিন প্রাণ হারাতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, জার্মান-তুর্ক বাহিনীর হাতে থাকায় বৃটিশরা মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে মিসরের ঘাঁটি থেকে সুবিধা করতে পারেনি বেশ কিছু কাল। বৃটিশরা সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্যালেষ্টাইনের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে জার্মান পক্ষের গোলা ও বোমায় একমাত্র সামরিক বাহিনীর পশ্চাদবর্তী দিন মজুরই নিহত হয় ৩০ হাজার। এ দিনমজুররা আসলে সাধারণ কৃষক, বৃটিশরা তাদের জবরদস্তি নিয়োগ করেছিল।

১৯১৫ সালের মে মাসে আবার ইংরেজ সহযোগীতায় দামেস্ক প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়! এ চুক্তি বস্তুতঃ পক্ষে আরব সামন্তদের এবং সিরিয়া, ইরান ও প্যালেষ্টাইনী ধনবাদীদের সন্ধিপত্রের নামান্তর। আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এ চুক্তি থেকে নবতর শিক্ষা লাভ করে।

বৃটিশ বাহিনী প্যালেষ্টাইনের উপর অভিযান শুরু করলে বৃটিশ গোয়েন্দা অফিসার লরেন্স হেজাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রসর হন এবং আকাবা দখল করে নেন। সেখান থেকে আরবরা লোহিত সাগরের তীর তুর্কী মুক্ত করে বৃটিশ বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধের সময়

আরবদের স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠনের সংগ্রামকে উপেক্ষা করে বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আরবকে বিভক্ত করার পায়তারা চালাতে থাকে। ১৯১৫ সালের ১০ই এপ্রিল বৃটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার মধ্যকার চুক্তিতে রাশিয়াকে কতিপয় অন্তরীপ প্রদান ও আরবে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তবে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের ভাগ্য তখনও নির্ধারিত হয় নি। এক বছর পর প্যালেষ্টাইনের ব্রাউন জোন বাদ দিয়ে বৃটেন বাকী সবটুকুই দখল করে ফেলে। ব্রাউন জোন রাখা হয় রাশিয়াও অন্যান্য দেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের পরিষদ হিসেবে। ধারণা ছিল, এখানে একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ তারা প্রতিষ্ঠা করবেন।

প্যালেষ্টাইন পুরোপুরি বৃটিশ দখলে চলে গেলে বৃটেন কোন অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রসর হলো না। বৃটেন ইহুদী আন্দোলনের সহায়তা দান শুরু করল। ১৮৮২ সালে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী একদল ইহুদী জাফায় কৃষি খামার স্থাপন করে। ১৯০৮ সালে ইহুদী আন্দোলন বিভিন্ন দেশ থেকে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী পাঠাতে থাকে। তুর্কীরা ইহুদীদের উপনিবেশ স্থাপনে কোন বাধা দেয়নি। ১৩ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত ৪৩টি বসতি গড়ে উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে ইহুদীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজার ইঙ্গ-ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফলাফল ধারণ করে ব্যালফোর ঘোষণা এবং ফরাসী ও ইতালীর সাথে আপোষ রক্ষার পর আরব বিদ্রোহীরা দৃঢ়তরভাবে বৃটিশ বিরোধী অভিযান শুরু করে। ভাগাভাগি হস্তান্তরের পরও প্যালেষ্টাইন থেকে যায় বৃটিশের হাতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে আরব ভূমি তুর্কী জোয়াল থেকে মুক্ত হলো বটে কিন্তু ফরাসী ও বৃটিশ প্রভাব থেকে তাদের মুক্তি হয়ে রইলো সুদূর পরাহত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আরব জনতার সংগ্রামের ইতিহাস শুরু হলো এক নবতর অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আরবে এগিয়ে চললো মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যে।

ফিলিস্তিন : রাষ্ট্রিক স্বরূপ

সমগ্র বিশ্বের একনিষ্ঠ মনোযোগ অধিকার করে যে বহুল আলোচিত বিষয়বস্তু সামগ্রিক চিন্তাধারাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিচ্ছে, তা হচ্ছে মধ্য-প্রাচ্য। আরব বিশ্বের অন্য সব ঘটনাপ্রবাহকে ছাপিয়ে যে সুর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, সে সুর 'ফিলিস্তিন' বা প্যালেষ্টাইনের কয়েক লক্ষ উদভ্রান্ত উদ্বাস্তু'র উদ্ভূত সমস্যা। বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত আজ এ' কথা আর অনুদ্‌ঘাটিত নয় যে, সাম্রাজ্যবাদী ইসরাইল তার পুঁজিবাদি প্রভুদের সাহায্য, সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়ে মানবতার জঘণ্যতম কার্য প্যালে-ষ্টাইনী জনসাধারণের অধিকার নিঃশেষে হরণ করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে, আগুন জ্বালিয়ে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করেছে হাজার হাজার ঘর বাড়ী; হত্যা করেছে অসংখ্য নিরীহ, নিষ্পাপ শিশু, বৃদ্ধ ও নারী; বন্দী শিবিরে আটকে রেখেছে যুবকদের; তাদের প্রতি চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন।

হানাদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে আজকের বিশ্ব-মানবতা, একত্রিত হয়েছে আরব বিশ্ব। প্যালেষ্টাইনের বীর জনসাধারণ সংগ্রামী জননায়ক ইয়াসির আরাফাতের পতাকা তলে এসে জমায়েত হয়েছেন। গেরিলা-যুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছেন মুক্তিকামী প্যালেষ্টাইনীরা।

কিন্তু এরপরও কথা থেকে যায়। এই যে ক্ষুদ্র একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এত আয়োজন, এত যুদ্ধ, এত সংগ্রাম কিন্তু সফলতা আসেনা কেন? একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এতোগুলো আরব-শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ছাড়ছে কোন্ অদৃশ্য শক্তির সক্রিয় পদক্ষেপে?—এর প্রত্যুত্তর বিশ্বের মানুষের অজানা নয়। ইসরাইল যুদ্ধ করছে, একা নয়, তার মুরুব্বীকে নিয়েই। মুরুব্বীর দয়া-দাক্ষিণ্যের সৌভাগ্য অর্জন করেই ইসরাইল তার প্রতিপক্ষদের নৃসংশভাবে পর্যুদস্ত করছে, হটিয়ে

দিচ্ছে! বৃহৎ শক্তি আমেরিকা দরাজ হাতে অঢেল সমরাস্ত্র সরবরাহ করছে ইসরাইলের মাটিতে; পক্ষান্তরে ন্যায় ও মানবতার সলিল সমাধি ঘটানোর জন্যই।

এখন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, তাহলে ইসরাইলের বর্তমান অধিকৃত ভূমি কি তাদের ন্যায্য পাওনা? প্যালেষ্টাইন কি তাহলে উড়ে এসে জুড়ে বসবার প্রয়াস চালাচ্ছে? তা না হলে ইসরাইল এত 'সিরিয়াসলি' আরবদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো কেনো?

বিষয়টা নিঃসন্দেহে পর্যালোচনার। আমরা এখন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রের মূল স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করবো।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দশ হাজার একশ' বাষট্টি বর্গমাইল জুড়ে ফিলিস্তিন রাজ্য। জর্ডান, সিরিয়া ও লেবানন তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ১৯১৮ সালে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে এর লোক সংখ্যা ছিল ৭,০৮০০। এর মধ্যে আরব ছিল শতকরা ৯৩% ভাগ এবং বাদ বাকী ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহুদী। ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের অবৈধ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বৃটিশ যখন পাত্‌তাড়ি গুটায়, তখন ফিলিস্তিনের লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,৫০,০০০ আরব, অন্যদিকে ইহুদীদের জনসমষ্টি ২ লক্ষ। ইহুদীরা জোড় পূর্বক তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে মাত্র ২লক্ষ ৪৭ হাজার আরব ফিলিস্তিনে থেকে যায়। অবশিষ্ট দশ লক্ষ আরব ইহুদী সন্ত্রাসের মুখে স্বদেশের মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে ভিটে-মাটি পরিত্যাগ করে বিদেশে বসবাস শুরু করে।

তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের মোটামুটি চিত্র এই রূপ। কিন্তু ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পূর্ব ইতিবৃত্ত ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। এই নামে পরিচিত ভূ-খণ্ডের পরিচয় খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরআনেও উল্লেখ আছে। বাইবেল ও কোরআনে ফিলিস্তিনকে 'কেনান' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে 'ক্রিট' এবং 'এজিয়ান' সাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত ফিলিস্তিনীদের নামানুসারে এই অঞ্চল ফিলিস্তিন নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টানদের আগমনের পূর্বেই এরা এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

ফিলিস্তিনীরা 'অগনন' সম্প্রদায় থেকে আসে। তবে অধিকাংশই আরব-বংশ সম্ভূত। সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারায় প্লাবিত ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই চিন্তাধারায় অবগাহন করে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকেই এ'অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রূপ লাভ করে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুসলিম দেশ ছিল। অবশ্য ১০৯৬ সাল থেকে ১১৮৭ পর্যন্ত ক্রুসেডিয়রা একে অধিকারে রেখেছিল। চারশত বছর ধরে এই এলাকা ওসমানিয়া শাসনাধীনে ছিল্। ফিলিস্তিন সে সময় স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণা বা ভিন্ন রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে আরবেরই একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে প্রতীয়মান হতো। ওসমানিয়া শাসনাধীনে থাকাকালীন ফিলিস্তিনের আরবেরা তুর্কীদের মতোই রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাধারণ অধিকার ভোগ করেছে। তাদের নিজস্ব সরকার ছিল, ছিল পৌরসভা এবং কন্‌স্টান্টিনোপলে ওসমানিয়া পার্লামেণ্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিও।

এরপর, মহাপ্রলয়ের মতো দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের দাবানল। ফিলিস্তিনের ভাগ্যাকাশেও নেমে আসে সীমাহীন বিপর্যয়। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সম্মেলনে উপস্থিত সকল জাতি ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন এবং জর্ডানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একই সময়ে এসব দেশকে অস্থায়ীভাবে 'লীগ অব নেশনে'র অবিভূক্ত করা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনকে নিয়ে নেয় বৃটেন।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বৃটেনের মহারাণীর উপনিবেশ হিসেবে ফিলিস্তিন শাসিত হয় এবং সকল প্রকার প্রতিনিধিত্ব এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে পদদলিত করে বৃটেন 'বালাফোর' (১৯১৬) ঘোষণা অনুসারে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস-ভূমি প্রতিষ্ঠা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১৯১৮ সাল থেকে বহিরাগত ইহুদীদের জন্য ফিলিস্তিনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কেবল তাই নয়, দেশের অর্থ-নীতিতে বহিরাগত ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়েও আইন প্রণয়ন করে। ইহুদীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অপমাণিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত আরব নাগরিকেরা এই অন্যায় আচরণ, অবৈধ ও অপমানাত্মক পরিস্থিতির প্রতিকার প্রার্থনা করে 'লীগ অব নেশান্'শের কাছে প্রার্থনা জানালো। এই জোর জবরদস্তিমূলক অন্যায় আচরণের প্রতিকার প্রার্থনা করে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য আরব-ফিলিস্তিনীরা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিলো, কিন্তু বৃটিশ বাহিনী প্রাণ-নাশ করে হলেও নৃশংসভাবে তা প্রতিহত করলো। এরপরও আরবদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা গেলো না। তারা বিদ্রোহ প্রকাশ করলো ১৯২০ সালে, ১৯২৮, ১৯২৯ এবং ১৯৩৬ সালে। আরবদের এই মারমুখী তৎপরতা রোধ করার জন্য ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সালে ফিলিস্তিনে বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। এরপর তারা জরুরী আইন প্রয়োগ করে সমগ্র ফিলিস্তিনকে বন্দী শিবিরে পরিণত করলো। নির্যাতনের শিকারে পরিণত হলো ১ লক্ষ আরব, শেষ রক্ত বিন্দু আত্মাহুতি দিল ১৫ হাজার ফিলিস্তিনী, আহত হলো ত্রিশ সহস্রাধিক।

ফিলিস্তিনে তখন ভয়ানক গোলমেলে পরিস্থিতি। সামরিক চক্র কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না প্যালেষ্টাইনী নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে। এই পরিস্থিতি সরে-জমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেক বৃটিশ কমিশনারকে ফিলিস্তিনে পাঠানো হলো। তাঁরা বললেন, ফিলিস্তিনকে কোনক্রমেই অবিভুক্ত রাখা সম্ভব নয়। এ'জন্যই যে, সেখানকার জনগোষ্ঠী মূলতঃ দুই বিপরীত প্রান্তিক। একদিকে লাঞ্ছিত আরব, অন্যদিকে সুবিধাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী। বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত প্রকাশের প্রেক্ষিতে ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে এবং বহিরাগত ইহুদীদের আগমনও সীমিত করা হবে।

এই ঘোষণা প্রকাশের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রাসবাদী ইহুদী দল সমূহ বৃটিশ বাহিনী, বৃটিশ সরকার এবং সাধারণ আরব নাগরিকদের উপর বর্বরোচিত পন্থায় সন্ত্রাস-মূলক তৎপরতা শুরু করলো। বৃটিশ সরকার ইহুদী চক্রের সক্রিয়তায়

বিপর্যয় বোধ করলো; তারা কোন ক্রমেই পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধিকারে আনতে সক্ষম হলো না।

অবশেষে, ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ব্যাপারটিকে জাতি সংঘে বিবেচনার্থে প্রেরণ করলো। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়। এ' সময় ফিলিস্তিনে আরবদের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার; এবং দেশীয় ইহুদীর সখ্যা ২ লক্ষ। বহিরাগত ইহুদীরা ছিল ৪ লক্ষ। পশ্চিমা শক্তি সমূহের চাপ ও প্ররোচণায় ১৯৪৭ সালের ২৯ শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনের বিভক্তির সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে একটি আরব রাষ্ট্র, একটি ইহুদী রাষ্ট্র এবং জেরুজালেমের জন্য আন্তর্জাতিক অঞ্চল গঠনের কথা বলা হয়।

ফিলিস্তিন খণ্ডিত করণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরপরই শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। বৃটিশ শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে ফিলিস্তিনী আরবরা হয়ে উঠলো দুর্বার, দুর্দমনীয় ও বিশৃঙ্খল এবং সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি থেকে হলো বঞ্চিত। অপর দিকে ইহুদীরা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারী হলো। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ফিলিস্তিনী আরবরা ইহুদীদের উপর বিজয়ী হতে থাকে। আরবরা ফিলিস্তিনের ৮২ ভাগ এলাকার উপর প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠিত করলো। আরবদের এই বিজয় লাভ পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে দৃষ্টিকটু প্রতীয়মান হলো, তাদের আঁতে ঘা লাগলো, বিচলিত হয়ে পড়লো পশ্চিমাশক্তি গুলো।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ইহুদী সংস্থা এবং সশস্ত্র ইহুদী দলগুলো আক্রমণ পরিচালনা করলো আরব গ্রাম ও শহরগুলোতে; বর্বরোচিত হামলা। যে সব কুচক্রী এসব হামলার নায়ক রূপে প্রকাশিত, তারা হচ্ছে 'হাগানা' ও 'ইরগুন'। 'দেরিয়াসী'নের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে এরাই। বর্বর নাজীদের নৃশংসতাকেও অতিক্রম করে এরা হত্যা করলো ৩৫০ জন আরব বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুকে। জাতিসংঘের নিরাত্তা পরিষদ এগিয়ে এলো হস্তক্ষেপ করার জন্য। নিরাপত্তা

পরিষদ যখন আরব-ইহুদীদের মধ্যে সেনাবাহিনী চাপিয়ে দিচ্ছিল, তখন আরব এলাকা দখলের জন্য গ্রামে ও শহরে ইহুদীরা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল অবিরাম। সহযোগী বৃটিশ সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কসহ অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করে ইহুদীদের মদদ যোগাচ্ছিল। বৃটিশ সৈন্যরা ইহুদীদের হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তুলছিল।

বৃটিশ ও ইহুদী চক্রান্ত আরো এগোলো। তারা সম্মিলিতভাবে ১৯৪৮ সালের ১০ই এপ্রিল—'দেরিয়াসীন', ১৮ই এপ্রিল 'টিবেরিয়াস', ২১শে এপ্রিল 'হাইফা', ২৭শে এপ্রিল 'সামাখ', ২৮শে এপ্রিল 'সালামেহ', 'ইয়াজুর', 'বিতদাজুন', ও 'জাফফার' পাশ্ববর্তী এলাকা ৩০শে এপ্রিল 'বেইসান', 'জেরুজালেমের নতুন আবাস,' ১০ই মে 'সাফাদ' এবং ১৩ই মে 'জাফফা' থেকে জোরপূর্বক নিরীহ আরব জনসাধারণকে অকারণে, বিনা অপরাধে বহিষ্কার করে দেয়া হলো। এরা ৫২৪টি গ্রাম ও শহর দখল করলো, অন্যদিকে ৩৮৫টি শহর ও গ্রাম বিধ্বস্ত করলো। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বৃটিশ সেনা সুপরিকল্পিতভাবে এই সব আরব গ্রাম ও শহর দখলে প্রভূত সাহায্য করলো। ইহুদী সন্ত্রাসে ভীত সন্ত্রস্ত আরবদের প্রতি বৃটিশ কম্যাণ্ডাররা আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল। এমনকি পাশ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়ার জন্য তাদেরকে ট্রাকে ট্রাকে পূর্ণ করে পেঁছে দিয়ে আসা হলো।

বৃটিশ সাহায্যপুষ্ট সংখ্যালঘু ইহুদীরা দশ লক্ষ আরব ফিলিস্তিনীকে তাদের পৈত্রিক ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করলো। অতঃপর সেই সব হতভাগ্য আরবীয়দের একমাত্র সম্বল, সকল শক্তির মহাশক্তিমান আধার আল্লাহর অনন্ত কৃপা এবং উষর মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর এতটুকু তাঁবুর আশ্রয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে বৃটেন এক তরফা ভাবে 'অচি' প্রথা প্রত্যাহার করে নিল। বিশ্ব ইহুদী সংস্থা ইহুদী নেতাদেরকে সংগ্রহ

করে উপস্থাপিত করলো এবং ঘোষণা করলো ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের কথা। ইহুদীদের ঘোষণার কয়েক মিনিট পরেই ডঃ উইজম্যান গোপন চুক্তি অনুসারে ইস্রাইলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে স্বীকার করে নিলেন। এদের এই একচেটিয়া সমর্থনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো আরব রাষ্ট্রগুলো। তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে এই অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখরিত হলো। অনেকেই একে প্রতিহত করবার পদক্ষেপ নিতে চাইলেন; কিন্তু এখানেও প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো বৃহৎ শক্তিবর্গ। তারা প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটিয়ে, এমনকি অস্ত্র সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেও ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবার আরব প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল। আরব রাষ্ট্রসমূহ যদি ঠিক সেই মুহূর্তেই কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারতো, তাহলে ফিলিস্তিন সমস্যা আজ এমন পর্বত-প্রমাণ উদ্ধতরূপে সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পেতোনা। লক্ষ লক্ষ আরব-জনতা ধুঁকে ধুঁকে মরতোনা তপ্ত মরুভূমিতে সামান্য তাঁবুর এতটুকু আশ্রয়ে! ধ্বংস হতোনা অসংখ্য বাড়ী ঘর; মৃত্যুর হিমশীতল বন্যায় ভেসে যেতোনা হাজার হাজার আরব-নাগরিক; বন্দী শিবিরগুলো পরিপূর্ণ হতোনা নির্যাতিত মানুষের আর্ত-বেদনায়!

বহিরাগত সংখ্যালঘু ইহুদী কর্তৃক অবৈধ ও অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে ৮০ ভাগ ফিলিস্তিনী ভূমি জবর দখল ও প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগুরু ফিলিস্তিনীদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত, ভৌগলিক সংহতি লংঘন, ধর্মীয় পবিত্র স্থান সমূহের অমর্যাদা, আন্তর্জাতিক আইন ও 'জাতিসংঘ' সনদ লংঘন করার মতো সীমাহীন অপরাধ করা সত্ত্বেও বৃহৎ শক্তি বর্গ ১৯৪৯ সালে তাদের উদ্ধত প্রভাব প্রয়োগ করে তথাকথিত ইস্রাইল রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্য করে নিলো।

ফিলিস্তিনী-আরব জনসাধারণের ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ পরিণতির সূত্রপাত এখান থেকেই।

ইস্রাইল মানবতার সমাধি ঘটিয়ে তার অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিলো। কিন্তু সে তার আগ্রাসী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন না করে বরং

আরব ফিলিস্তিনীদের ধর্মীয় জীবনেও হস্তক্ষেপ করলো। মসজিদে আগুন দিলো, মুসলমানদের ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠানে মাথা ঘামালো, সামান্যতম সন্দেহের বশবর্তী হয়েও নৃশংস শাস্তি দান করতে দ্বিধা করলোনা। আরব-মুসলিমদের অবস্থা দু'দিক থেকেই অত্যন্ত নাজুক হয়ে দাঁড়ালো ; সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দিকেও। এই যখন তাদের পরিণতি, এমতাবস্থায় চোখ বুঁজে ইস্রাইলের খামখেয়ালীপনা আচরণ সহ্য করা যায়না। জেগে উঠলেন আরব নেতৃবৃন্দ। মানবতার অবমাননার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার এক চেটিয়া দখলের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন। ১৯৬০ সালে আরব রাষ্ট্রবর্গ গঠণ করলেন "প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংস্থা" (P. L. O.)। এঁরা প্রথম অভিযান পরিচালনা করলেন ১৯৬৫ সালের ১ লা জানুয়ারীতে।

অন্তরের দিক থেকে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তরে শোষিতের ক্ষত-বিক্ষত রূপে সংগ্রামী মনোবৃত্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, নিষ্ক্রীয় স্বাধীনতালোপী ফিলিস্তিনীরা আশার আলো দেখতে পেলেন। তাঁরা মাতৃভূমি হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কে ডাক দেবে তাঁদের নতুন সূর্যোদয়ের সোনালী দিগন্তে ; যেখানে অনন্ত স্বাধীনতার ফল্গুধারা প্রবহমান! কে ডাক দেবে তাঁদের স্বাধীনতার সাগরে অবগাহন করতে। এর সঠিক পথ-নির্দেশ তাঁরা পাচ্ছিলেন না। পি, এল, ও, শুনালো তাঁদের ইপ্সিত সূর্যের আগমন-বার্তা। ফিলিস্তিনী আরবগণ ১৯৪৮ সালের পর এই প্রথমবারের মতো সংঘবদ্ধ হলো, সংগঠিত হলো। বজ্র শপথে উদ্দীপ্ত হলো। হয় প্রাণ দেবে, না হয় মাতৃভূমি অধিকার করবে! ফিলিস্তিনী অবহেলিত উদ্বাস্তরা নতুন আশা ও নতুন সূর্যের আকাঙ্খার সমর্থনে এলো এগিয়ে।

পি, এল, ও, তাদের স্বাধীনতা অর্জনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন ; কিন্তু সংগঠনটি যেন তেমন আশাব্যঞ্জক ফলোদয় করতে পারছেনা। তেমন সক্রিয় ফলাফল লাভে সক্ষম হচ্ছেনা ; হয়তো এ'জন্যই ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে ফিলিস্তিন ন্যাশ-

নাল কাউন্সিল, 'আলফাতাহ' এবং সিরিয়ার 'বাথ' পার্টির সমর্থক আস্ সাইকার প্রথম বৈঠকে "প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংস্থা"র আছমত সুকাইরীকে নেতৃত্বচ্যুত করলেন। এর পরেই এলেন বিশ্বের অন্যতম সংগ্রামী জননায়ক ইয়াসির আরাফাত, ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তিনি পি,এল,ও,র দায়িত্বভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করলেন; নিযুক্ত হলেন কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান।

ইতিপূর্বে, প্যালেষ্টাইনী সংস্থা আলফাতাহ্র শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অনমনীয় সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আকর্ষণ করে। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র প্যালেষ্টাইনীদের সংগ্রাম নিজের শক্তির প্রতি হুমকী স্বরূপ মনে করে। আর এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে পি, এল, এল, পি-র একটি ছিনতাই ঘটনাকে অযুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে জর্ডানকে প্ররোচিত করে গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে, যার রক্তাক্ত ফসল "ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর" ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সময় প্রতিবাদ ছাড়া জর্ডানী নৃশংসতা থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামকে রক্ষার জন্য তেমন কোন কাজ আরব রাষ্ট্র সমূহ করেনি। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে ইয়াসির আরাফাতের বক্তব্য ঃ—"জর্ডানে প্যালেষ্টাইনী বিপ্লব ও জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধ্বংস যজ্ঞের পরই ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের অভ্যুদয়। আমরা ২৫০০০ হতাহতকে হারিয়েছি এবং কারারুদ্ধ হয়েছেন ৮০০০ জন। জর্ডানের পূর্বতীরে এ'আমাদের জনগণের জন্য এক বিভীষিকাময় স্মৃতি। জর্ডানে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরাইল এবং সি, আই, এ,রাই দায়ী।"

ইসরাইল সবচে' নগ্ন ও বেপরোয়া হামলা পরিচালনা করে ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালে। তাদের সম্প্রসারণবাদ চরিতার্থের এই হীন পন্থা অবলম্বণ বিশ্ববাসী কেবল চোখ দিয়েই প্রত্যক্ষ করলোনা, সমগ্র বিশ্বের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পথ থেকে এ' একটি মারাত্মক হুমকী ও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। ১৯৬৭ সালের আক্রমণ পরিচালনা করে সাম্রাজ্যবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনী এলাকা ছাড়াও লেবানন, মিশরের সুয়েজ

এবং সিরিয়ার গোলান ও গাজা এলাকার বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে নিলো। বিশ্ব হতচকিত হয়ে দেখলো ইসরাইলের এই বর্বরতম পৈশাচিক পদক্ষেপ। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন আরব নেতৃবৃন্দ।

ইসরাইলের আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এবার তারা শুধু ফিলিস্তিনীদেরই নয়, সমগ্র আরব বিশ্ব এমন কি, পৃথিবীর ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের অন্তরের প্রচণ্ডতম আঘাত হানলো। তারা পবিত্র স্থান "বায়তুল মোকাদ্দাসে" আগুন জ্বালিয়ে অনেক খানি অংশ ভস্মীভূত করলো। এরপরও, প্রতিনিয়ত পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডানের ভূমিতে ঢুকে গ্রাম ও শহরের নিরীহ জনসাধারণের প্রতি চালাতে লাগলো আকস্মিক আক্রমণ। ধ্বংস হতে লাগলো জনপদ, প্রাণ ও বাড়ী-ঘর। কিন্তু নির্বিকার ইসরাইল।

ইসরাইলের এই রণ-মূর্তির প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন ফিলিস্তিনী জনতা এবং তাদের অগ্রদূত জন-নায়ক ইয়াসির আরাফাত।

ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের আলেখ্য

১৯৬৪ সালের বর্ষ শুরুর প্রাক্কালে একদল ফিলিস্তিনী কমাণ্ডো জর্দান এবং ইসরাইলী যুদ্ধবিরতি এলাকা দিয়ে ইসরাইলে প্রবেশ করে ফিলিস্তিনে ইহুদী হানাদারদের উপর হামলা করার জন্যে। এ অভিযানে অংশ নেন একদল অশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রহীন উদ্বাস্তু। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অভিযান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক কাঠামো এবং এ এলাকার সংঘর্ষের প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে। এর মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনীদের ভাগ্য নির্ধারণে আরব রাষ্ট্রবর্গ বা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির ভূমিকার চেয়ে আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যাক্তি ঘটে।

সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে বৈশিষ্ট্যহীন এই প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন ফিলিস্তিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আল-ফাতাহর সামরিক বিভাগ। এটা শুধু ইসরাইল নয় বরং আরব রাষ্ট্রবর্গের জন্যেও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। ১৯৪৮ সালে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহ ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ভোগ করে আসছিল। পরবর্তী ১৬ বছরে ফিলিস্তিনীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা শত্রু কবলিত উদ্বাস্তু শিবিরে অথবা রাষ্ট্রহীন ভাবে আরব ভাইদের শাসিত রাষ্ট্রেই রয়ে গেলো। ফিলিস্তিনী হিসেবে পরিচয় দানের স্বাধীন ইচ্ছা অবদমিত রয়ে গেলো। সুতরাং রাজনীতি সচেতন ফিলিস্তিনীরা আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট এবং বাথ পার্টি'র মত চরমপন্থী আরব জাতীয় আন্দোলনে ঢুকে পড়ল।

১৯৫৬ সালে মিশরের বিরুদ্ধে ত্রিপক্ষীয় হামলার পর একদল ফিলিস্তিনী গাজা এলাকায় রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। এটাই স্বাধীন প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম দেয়। কায়রোর

ফিলিস্তিন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং তার কয়েকজন সহকর্মী 'আলফাতাহ' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। যা ফিলিস্তিনীদের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্র বর্গের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার জন্যে স্বাধীনভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

এই স্বাধীন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি আরব রাষ্ট্রবর্গের চাপ এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমেই আলফাতাহ সংগঠিত হয় এবং আলজিরিয়ার বিপ্লবী এবং ১৯৬৩ সাল থেকে সিরিয়ার বাথদলীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করে। এই সাহায্য নিয়েই তারা প্রথম অভিযান পরিচালনা করে।

১৯৬০ সালে আরব রাষ্ট্রবর্গ ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (P.L.O) গঠন করলে আল-ফাতাহ ফিলিস্তিনীদের উপর আরব রাষ্ট্রবর্গের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার পুনঃ প্রচেষ্টা হিসেবে এটাকে দেখে! আরাফাত এবং তাঁর সহকর্মীরা জর্দান নদীর প্রধান স্রোত পরিবর্তনের ইস্রাইলী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আরব রাষ্ট্রবর্গের অক্ষমতা এবং অনিচ্ছা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

তারা পি, এল, ও,কে কার্যক্ষমতাহীন কাগুজে কমিটি হিসেবে বাতিল করেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন।

১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারী প্রথম অভিযান চালানো হয় এবং আল-ফাতাহর সামরিক বিভাগ আল-আসিফা তাদের প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের পর প্রথম বারের মত ফিলিস্তিনীরা সংগঠিত হলো। প্যালেষ্টাইনীদের নেতৃত্বাধীন সংস্থা ফিলিস্তিনের জন্যে লড়তে এবং মরতে অঙ্গীকার করল এবং আরব রাষ্ট্রবর্গের মনোভাবের প্রতি অমনোযোগী হল।

১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের আগে মাত্র আড়াই বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের নিমিত্তে গড়ে ওঠা আল-ফাতাহ এবং অন্যান্য ছোট ছোট সংস্থা দু'দিকের শত্রুর মোকাবিলায় বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হলো।

ইস্রাইল ছাড়াও জর্দানের হাশেমীয় বংশোদ্ভূত সরকারের সঙ্গে তাদের সমস্যা ছিল। জর্দান ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর পুরাতন ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরস্থ অবশিষ্টাংশ নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে। জর্দান কোন স্বাধীন ফিলিস্তিনী সংস্থাকে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখে আসছে। আল-আঁসিফার প্রথম শহীদ ইসরাইলের হাতে নয় জর্দানী সৈন্যের হাতে। জর্দানী গোয়েন্দা বাহিনী ১৯৬৭ সালে ধীরে ধীরে সংহত প্রতিরোধ বাহিনীর গেরিলা এবং তাদের সমর্থকদের বিরাট তালিকা প্রস্তুত করেছিল ইসরাইলীদের দেয়ার জন্যে। এছাড়া অন্য কয়েকটি আরব রাষ্ট্রও প্রতিরোধ সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। আরব লীগ আরব সংবাদপত্র সমূহের প্রতি আবেদন জানিয়েছে আল-ফাতাহ্‌র সামরিক ইশতেহার প্রকাশ না করার জন্যে। সরকারী উদ্যোগে পত্রিকাগুলোকে বলা হয়েছিল যে, গেরিলা কার্যক্রম ইসরাইলী চরদের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে। পি, এল, ও, আল-ফাতাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

প্রতিরোধ আন্দোলন যখন কিছুটা সংগঠিত হলো এবং ইসরালীদের উত্যক্ত করা শুরু করল তখন তারা পার্শ্ববর্তী আরব গ্রামে প্রতিশোধাত্মক হামলা শুরু করলো, অপরদিকে ৬৭'র জুন যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাস আগেই জাতিসংঘে ইসরাইলী প্রতিনিধি অধিকৃত ফিলিস্তিনে আক্রমণের ধারা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে আল-ফাতাহকে দায়ী করেছে। ইসরাইলী নির্যাতন বা আরবদের চাপ কোনটাই প্রতিরোধ সংগ্রামকে প্রতিহত করতে পারলো না। আল-ফাতাহ্ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পি, এল, ও, সদস্যেরও মন জয় করতে পেরেছে। জুন যুদ্ধ যখন শুরু হলো ফিলিস্তিনী গেরিলারা আরবদের সঙ্গে তাদের শক্তি যুক্ত করল এবং পশ্চিম তীরও গাজা এলাকায় অগ্রসরমান ইসরাইলীদের মোকাবিলায় আরব বাহিনী পিছু হটতে শুরু করলে গেরিলারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে, জুন যুদ্ধের পর গেরিলারা দেখতে পেলেন যে, তারা বিরাট রাজনৈতিক সুযোগ হস্তগত করেছে। আরবদের পদক্ষেপে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে এ পৌরাণিক কথা

বাতিল হয়ে গেলো। যুদ্ধের পর প্রতিটি ফিলিস্তিনী হয় বিদেশীদের দখলীকৃত এলাকায় নতুবা প্রবাসে ছিল। জুনের শেষে আল-ফাতাহ নেতৃবৃন্দ গেরিলা তৎপরতা শুরু করার জন্য আলোচনা করতে বসলেন। অন্য তিনটি দলের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছতে না পেরে আল-ফাতাহ আগষ্টে পুনরায় সামরিক অভিযান শুরু করে। অন্যান্য দলগুলো পরবর্তীকালে পপুলার ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইন (P.F.L.P.) নামে আরব জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত একটি সংস্থা গঠন করে। এ সময় আল-আসিফার বহু অফিসার শহীদ হন এবং গেরিলারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অপর দিকে ইসরাইল জর্দানী গোয়েন্দা বাহিনীর রেকর্ড দখল করে অনেক গেরিলা সমর্থককে গ্রেফতার করে।

জুন যুদ্ধে পরাজয়ের মারাত্মক গ্লানি সত্ত্বেও গেরিলারা প্রতিরোধ তৎপরতা শুরু করায় প্যালেষ্টাইনী এবং আরব জনগণ বুঝতে পারল যে গেরিলারা শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত। মিশর এবং সিরিয়া নিজেরা অভিযান চালাতে অসমর্থ হয়ে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামকে সাহায্য করতে লাগল। কেবল মাত্র জর্দানের বাদশাহ হোসেন গেরিলাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন গেরিলাদের জর্দান নদী অতিক্রম প্রতিহত করার জন্যে। সেনাবাহিনী বেশীর ভাগ আদেশ অবজ্ঞা করে, কেননা তাদের অনেকে নিজেরাই ফিলিস্তিনী ছিলেন। কমাণ্ডোদের হামলায় ইসরাইলীরা বিরক্ত হয়ে উঠে, অবশেষে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ইসরাইল জর্দানের ওপর প্রতিশোধাত্মক হামলা চালায়। ফলে গেরিলারা রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে যা আরব বিশ্বে গেরিলাদের প্রাধান্যের জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল।

কারামেহ গ্রামে ইসরাইলী হামলা প্রতিরোধ সংগ্রামীদের প্রথম সামরিক সাফল্য বয়ে আনে। তারা এতে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার সুযোগ লাভ করে। সমস্ত দিনব্যাপী প্রতিরোধের পর ইসরাইলীদেরকে জর্দান নদী পার হয়ে যেতে বাধ্য করে।

পশ্চাতে বিরাট সংখ্যক ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য যানবাহন ও

সঙ্গে অগণিত লাশ নিয়ে ইসরাইলীরা পশ্চাদাপসরণ করে। কারামেহ হাজার অভিযানের পর আরব বিশ্বে আল-ফাতাহর সমর্থন বেড়ে যায় এবং হাজার ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু আশা ও গর্বের নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়ে আল-ফাতাহর সমর্থনে এগিয়ে আসে। এ পরিবর্তন অনেকটা বৈপ্লবিক।

নতুন রিক্রুটদের সাহায্যে গেরিলা সংস্থা ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে এবং অধিকৃত এলাকায় তাদের অভিযানের মাত্রা নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয়।

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে ফিলিস্তিন ন্যাশনাল কাউন্সিল, আল-ফাতাহ এবং সিরিয়ার বাথ পার্টির সমর্থক আস্‌সাইকার প্রথম বৈঠকে পি, এল, ও, আহমদ সুকাইরীকে নেতৃত্বচ্যুত করে। ইয়াসির আরাফাত ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পি, এল, ও,র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। আল-ফাতাহ সংগঠনের কলেবর বৃদ্ধি করে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামের অসামরিক শাখা যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে এবং গেরিলা সংগঠনগুলোর সমন্বয়ের জন্য ফিলিস্তিন সশস্ত্র সংগ্রাম কমাণ্ড (পি, এ, এস, সি,) গঠন করে।

প্রতিরোধ সংগঠনের ঐক্য আসেনি। কারণ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রবর্গের মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। পি, এফ, এল, পি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে যেমন পি, এফ, এল, পি, জেনারেল কমাণ্ড, ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্যে পপুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট।

পরের সংগঠনটি কড়া মার্কসীয় দর্শনের অনুসারী। কিন্তু ইসরাইলের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত ভাবে বাড়তে থাকে! ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে একমাসে প্রতিরোধ সংগ্রামীরা অধিকৃত এলাকায় কয়েকশ অভিযান চালায়। এতে ইসরাইলীরা সামরিক দিক থেকে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে তারা জর্দান এবং লেবাননী এলাকায় গেরিলা অবস্থান গুলোর উপর প্রতিশোধাত্মক হামলা চালায়।

শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থের প্রতি হুমকি আঁচ করতে পেরে পি, এফ, এল, পি, র একটি ছিনতাই ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে জর্দানকে গেরিলাদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত "ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর" অভিযান চালাতে প্ররোচিত করে। জর্দান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয় যা ইসরাইলীরাও পারেনি।

"ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের" সময় প্রতিবাদ ছাড়া জর্দানী নৃশংসতা থেকে 'প্রতিরোধ সংগ্রামকে' রক্ষার জন্যে তেমন কোন কাজ আরব রাষ্ট্র করেনি। ১৯৭১ সালের জুলাইতে গেরিলা আন্দোলন জর্দান থেকে বহিস্কৃত হলেও মার্কিন, ইসরাইলী এবং জর্দানী বিমানগুলো শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়নি। আম্মান এবং জেরাস সংঘর্ষে প্রতিরোধ সংগ্রাম যে সংহতি অর্জন করেছিল তা অটুট রয়েছে, গেরিলাদের উৎখাতের জর্দানী ও ইসরাইলী উদ্দেশ্যের ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাদশাহ হোসেন এবং প্রধান মন্ত্রী গোল্ডামেয়ার সহ উল্লেখযোগ্য ইসরাইলী নেতাদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা আঁচ করতে পেরে গেরিলারা বাদশাহ হোসেনকে উৎখাত করার নীতি গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় ১৯৭৩ সালের মে মাসে লেবানন সরকার এবং গেরিলাদের মধ্যেও সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষও প্রতিরোধ সংগ্রামকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়নি।

১৯৪৮ সাল থেকে যে সব এলাকা ইসরাইলী জবর দখল করে আছে সে সব এলাকায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা হয়। কারণ আল-ফাতাহ এবং পি, এল, ও,র অন্যান্য অঙ্গদলগুলো তখন লোকদেরকে সংগঠনভূক্ত করেছে যারা ২০ বছর পর্যন্ত ইসরাইল অধিকৃত এলাকায় বসবাস করেছে। তারা মুক্ত রাষ্ট্র গঠণের লক্ষ্যে ইহুদীবাদের অবিশ্বাসী এমন কিছু ইহুদীর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ইহুদীও প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সাহায্য করতে শুরু করেছে। ১৯৭৩ সালে ইসরাইলী পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যের

পত্রকে গেরিলাদের সাথে সংযোগ রক্ষার অভিযোগে জেলে দেয়া হয়েছে।

১৯৭০-৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটা সমাধান চাপিয়ে দিতে মার্কিন প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম সারির কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলী শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আরব রাষ্ট্রবর্গের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে পি, এল, ও,র আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনায় জটিলতা দেখা দিলেও গেরিলারা ক্রমেই ইহুদীদের জন্যে ভয়ানক রূপ নিতে থাকে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে বৈরুত অভিযানে ইসরাইলীরা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় গেরিলাকে শহীদ করলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে গেরিলাদের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি সুসংহত থেকে যায়।

১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে গেরিলারা শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা বাড়াবার সুযোগই শুধু পায়নি বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধের সময় মিশর এবং সিরিয়া রণক্ষেত্রে অধিকৃত এলাকার মধ্যে থেকে গেরিলারা যুদ্ধ করেছে এবং অসংখ্য ইসরাইলী সৈন্যকে হতাহত করেছে।

যুদ্ধের পর অধিকৃত এলাকায় গেরিলাদের সমর্থনে গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়। অধিকৃত এলাকায় ইসরাইলী শহরগুলোতে অব্যাহত গেরিলা তৎপরতায় ইহুদীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সালের ফিলিস্তিন অভিযানের পর ইহুদী নরপশুরা তিনজন গেরিলার লাশকে আগুনে পুড়ে ক্ষোভ মিটায়।

অক্টোবর যুদ্ধের পর পি, এল, ও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কুটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে।

তারা বিশ্ববাসীকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মূল কারণ আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ নয়। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের। সতর্ক প্রচেষ্টার ফলে পি, এল, ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সমর্থন লাভ করে, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সমর্থন লাভ করে এবং ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের স্বীকৃতি

লাভ করে পি, এল, ও,র চেয়ারম্যান হিসেবে ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমর্থকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন পরবর্তী কালে পি, এল, ও, কে স্থায়ী পর্যবেক্ষক এবং প্যালেষ্টাইনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

রাবাতে অরব শীর্ষ সম্মেলনের পরই জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত আসে। রাবাত শীর্ষ সম্মেলন জর্দান নদীর পশ্চীম তীর থেকে জর্দানী দাবী প্রত্যাহারে জর্দানকে বাধ্য করে। ফিলিস্তিনীদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে ইসরাইলী দখল থেকে ফিলিস্তিনের যে কোন এলাকা মুক্ত করলেই তা পি, এল, ও,কে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তও শীর্ষ সম্মেলন গ্রহণ করে।

গত দশকে প্রতিরোধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে! পি, এল, ও,কে শুধু ইসরাইলীদের সশস্ত্র হামলার মোকাবিলাই করতে হয়নি উপরন্ত দুনিয়ার বুক থেকে সংস্থাকে জর্দানের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তও মোকাবিলা করতে হয়েছে। সংস্থার অস্তিত্ব এবং প্রতিনিধিত্বকে অস্বীকার করার জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মোকাবেলাও করতে হয়েছে। সকল ষড়যন্ত্র বানচাল হয়েছে।

দশ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের পর আজ ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে শক্তি শালী। এর সামরিক অভিযান গুলো শত্রুর মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার করেছে। এর কূটনৈতিক অভিযান আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যাপক স্বীকৃতি যুগিয়েছে। এখন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ফিলিস্তিনী জনগণের জাতীয় ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ব্যতিরেকে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

দশ বছর আগে কয়েকজন গেরিলা তামাদী অস্ত্র নিয়ে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। ইসরাইলের ছিল বিশ্বব্যাপী সমর্থন, সর্বাধুনিক অস্ত্র ও সৈন্য এবং মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা।

ফিলিস্তিন প্রতিরোধের প্রথম দশক সমস্যা এবং সামরিক অসুবিধা সত্ত্বেও অতুলনীয় সাফল্যের দশক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

প্যালেষ্টাইনী জনতার অগ্রদূত
ইয়াসির আরাফাত

ইয়াসির আরাফাত। একটি নাম ; একটি আপোষহীন সংগ্রাম। একটি প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহ। বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তি দূত, একটি প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিত্ব।

ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আরাফাতের প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ; পি, এল, ও, র দলীয় প্রধান হিসেবে। তারপরের প্রতিদিনের, প্রতিমূহুর্তের উজ্জ্বল সংগ্রামী অনুচ্ছেদগুলো প্যালেষ্টানী জনগণের কাছে ভবিষ্যতের আশাব্যঞ্জক দ্বার উদ্‌ঘাটনের বার্তাবহ। আরাফাত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েই সংগঠনকে সর্বপ্রথম শক্তিশালী করে তুললেন ; প্রতিরোধ সংগ্রামকে অধিকতর প্রাণবন্ত করে তুললেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ইয়াসির আরাফাত অত্যন্ত নম্র ও সরল। আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি যেমন লৌহ-মানব, তেমনি ব্যক্তিগত আচরণে শিশুর মতো কোমল। সেই চিরপরিচিত ছবি ; হাসিমাখা সংগ্রামদৃপ্ত মুখ। মাথায় সাদা কালো চেকের মস্তকাবরণী, পরণে—ঢোলা প্যাণ্ট ও জেকেট, পায়ে মোটা জুতো,—এই নিয়ে আরাফাত। কখনো মরুভূমির উষর প্রান্তরে, কখনো বা পাহাড়ের নির্জন গুহায় ; কখনো বাবলা দেবদারু বনের মধ্যে বসে গেরিলাদের পরিচালনা করছেন ফিলিস্তিনী জনতার নেতা ইয়াসির আরাফাত। সুখের মুখ হয়তো তিনি দেখেননি। সব সময় তাঁকে অতিবাতিহ করতে হয় অত্যাচারী ইহুদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম সংগ্রাম। সেই সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, তাদের মাটিতে দাঁড়িয়েই (জাতিসংঘ পরিষদ) আরাফাত তাদের গালাগালি করলেন, ফিলিস্তিনীদের প্রতি অবিচার করা

হচ্ছে, এ'কথা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে বিষ ছিল না। আরাফাত যে বিশ্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালের ২রা নভেম্বরে জাতিসংঘে দেয়া তাঁর ভাষণ। আরাফাতের নব্বই মিনিটকাল স্থায়ী বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান, বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর উপলব্ধি, নিপীড়িত জনগণের দুর্দশা, নিপীড়ক শাসকের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ছলা কলা-কৌশল তিনি সারগর্ভ তথ্য নির্ভর যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর এই দূরদর্শী প্রজ্ঞার মাধ্যমে তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবেও বিশ্বের রাজনীতির রঙ্গ মঞ্চে আবির্ভূত হলেন।

ইয়াসির আরাফাত পি, এল, ও, সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করলেন। হাজার হাজার মুক্তিকামী ফিলিস্তিনী তাঁর পতাকাতলে এসে জমায়েত হলেন। দুর্দমনীয় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান ইসরাইলী নৃশংসতার প্রতিকারে কম্যাণ্ডো আক্রমণ পরিচালিত করলো। শুধু পুরুষরাই নয়, এই জীবন-মরণ হোলি খেলায় মেতে উঠলো নারী সমাজও। পুরুষ ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে এলো নারীরাও। বিশ্বে অগ্নিকন্যা বলে পরিচিত বিপ্লবী লায়লা খালেদ এদের অগ্রগণ্য। পৃথিবীর মানুষকে বিস্ময়ে হতচকিত করে দিয়ে ১৯৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে লায়লা খালেদ যে অকল্পনীয় দুঃসাহসিক কাজটি সম্পন্ন করলেন : তা হচ্ছে প্যালেষ্টাইনী মুক্তি যোদ্ধাদের মুক্তিপণের দাবীতে বিমান হাইজ্যাক। এরপর সমগ্র আরব বিশ্ব দুলে উঠলো যুদ্ধে, সংঘাতে, আতংকে। ফিলিস্তিনী কম্যাণ্ডোরা আরও কয়েকবার বিমান ছিনতাই করলেন, মিউনিখের অলিম্পিক (১৯৭২) সেন্টারে ইসরাইলের খেলোয়ারদের আটক করলেন, জেরুজালেম, তেলআবিবে গোপন আক্রমণ পরিচালনা করলেন। এই সব সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে প্যালেষ্টাইনীদের সংগ্রাম ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠলো। আরব নেতৃবৃন্দও তাদের সমর্থন করলেন—লিবিয়ার কর্ণেল মোয়াম্মার গাদাফী, সৌদি আরবের বাদশাহ্ ফয়সল, সিরিয়ার হাফেজ আল-আসাদ এঁরা সর্ব প্রকার সহযোগিতা ও সমর্থনের হাত প্রসারিত করলেন।

১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে মিসরের গোলান ফ্রন্টসহ বিস্তৃত এলাকা এবং সিরিয়া ও লেবাননের বিস্তীর্ণ এলাকা ইসরাইল জবর দখল করে আছে। জাতিসংঘে বার বার প্রস্তাব পেশ ও পাশ করেও তঁরা তাঁদের হারানো ভূমিকে ফিরে পাচ্ছেনা। একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকে অনেক দিন যাবত। অবশেষে এই "কোল্ড ওয়্যার" ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করলো। যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র আরব-বিশ্ব জুড়ে। ইস্রাইল এবারে বেশ কিছুটা কাবু হলো। মিসরের কিছু অংশ ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। যুদ্ধোত্তরকালে মিসরের সঙ্গে ইস্রাইল কিছুটা বাধ্য হলো সমঝোতায় আসতে। ডঃ কিসিঞ্জার তাঁর শান্তির থলে নিয়ে বার কয়েক ঘোরাফেরা আলাপ-আলোচনার পর বোঝা যাচ্ছে, ইসরাইল মিসরের সঙ্গে মোটামুটি একটা শান্তির পথে আসতে চায়।

কিন্তু ফিলিস্তিন প্রশ্নে এখনো ইসরাইল অনমনীয়। সমস্যা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পারবো বিগত ত্রিশ বছর যাবত প্যালেষ্টাইনরা মাতৃভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত। অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে টিকে বসেছে ইসরাইল। তার সম্প্রসারণমূলক হামলায় পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমুহের শান্তি বিপর্যস্ত; যদিও ৭৩-এর অক্টোবর যুদ্ধে আরবদের ষ্ট্রাটেজিক বিজয়ের পর অবস্থার মোটামুটি পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭৪-এর নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উনত্রিশতম অধিবেশনে ইয়াসির আরাফাতের বক্তৃতা দানের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সুস্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রহীন প্যালেষ্টাইন অর্গানিজেশনের প্রধান আরাফাতকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়ে জাতিসংঘে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্যালেষ্টাইনীদের ন্যায্য অধিকারকে এড়িয়ে যাওয়া যে অসম্ভব, তা এখন প্রমাণিত সত্য।

১৯৭০ সালের ১২ থেকে ১৫ই জুলাইর জেদ্দা সম্মেলনে প্যালেষ্টাইনীদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ব মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের বিষয়টি গৃহীত হয়। এর ফলে প্যালেষ্টাইন ইস্যু আজ আর কোন আঞ্চলিক সমস্যা নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের জাতীয়

সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা। সমগ্র বিশ্বের শান্তির স্বার্থেই এর দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। আর সেই সমাধান হল, ইসরাইলের পরিবর্তে স্বাধীন সার্বভৌম প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন এবং বিশ্বজনমতের স্বীকৃতি। ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে (১৯৭৫—১৫ই জুলাই) গৃহীত প্রস্তাব এই দাবীর রাজনৈতিক ভিত্তিকে করে তুলেছে আরো সুদৃঢ়।

জেদ্দা সম্মেলনের পর এ'কথা ঐতিহাসিক সত্য রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্যালেষ্টাইন প্রশ্নে সমস্ত আরব এবং মুসলিম দেশগুলো নিপীড়কের বিরুদ্ধে, জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার এবং অত্যাচারিত মুক্তিকামীজাতি এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ঐতিহাসিক ও শাশ্বত নীতিকেই মেনে নিয়েছে।

বিগত ১৯৭৪ সালের ১৩ই নভেম্বর ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন, তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য ভাষণ। তিনি প্যালেষ্টাইনী সংগ্রামের মূল সুর ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থাকে (PLO) ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। গত ২রা নভেম্বর ১৯৭৪, সাধারণ পরিষদে মুক্তিসংস্থার নেতা ইয়াসির আরাফাতের ভাষনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জাতিসংঘে মুক্তিসংস্থার জনাব ইয়াসির আরাফাতকে রাষ্ট্রীয় প্রধানের ন্যায় সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল।

জনাব সভাপতি!

সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে এবং যাদের প্রচেষ্টায় ফিলিস্তিন সমস্যা পেশ করার জন্য আমার সুযোগ হয়েছে তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। ফিলিস্তিনের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী। এই পদক্ষেপ আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার সাফল্য যেমন নির্দেশ করছে তেমনি এটি এই আন্তর্জাতিক সংঘের অগ্রগতির চিহ্নও বটে। এ এক নূতন দিকের ইঙ্গিত। আজকের দুনিয়া যেমন কালকের দুনিয়া থেকে আলাদা তেমনি আজকের জাতিসংঘ গতকালের জাতিসংঘ নয়!

জাতিসংঘ এখন দুনিয়ার ১৩৮টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। বলতে গেলে গোটা দুনিয়ারই প্রতিনিধি বনে গেছে। এখন মানবাধিকার সনদ প্রনয়নের যোগ্যতা যেমন এর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি সাম্য, ন্যায়বিচার ও কার্যকরী শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তিও বেড়েছে।

কেবল আমরাই নয় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার সকল জাতিই আজ এটা অনুভব করছেন। এটাই দুনিয়ার সকল জাতির চোখে এই সংস্থার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচার-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এবং জাতিগুলোর আজাদী হাসিলে পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। এর প্রয়াস প্রচেষ্টায় এমন এক দুনিয়া আত্ম-প্রকাশ করবে যা পুরোনো ও নূতন সমস্ত রকম জাতিগত ও বর্ণগত আগ্রাসন থেকে হবে মুক্ত।

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন দুনিয়ার মানুষ সাম্য সুবিচার ও ইনসাফের আকাঙ্খা পোষন করছে। নিপীড়িত জাতি গুলো সম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং জাতি বৈষম্যের নাগপাশ হতে মুক্তি কামনা করছে। আজাদী হাসিল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য এরা সংগ্রাম করে চলেছে। তারা চায়, পারস্পরিক সহযোগীতা ও মর্যাদা প্রদর্শন, অন্য রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়-তুফান ইত্যাদি মোকাবেলার জন্য সংগ্রাম চলুক আজকের মানুষ তাও কামনা করে। মানবিক কল্যাণের জন্য তথ্য ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বেশী বেশী ফায়দা হাসিল করা চাই—যাতে করে উন্নত ও উন্নয়নগামী দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমে আসে।

কিন্তু দুনিয়া জোড়া অশান্তি, জুলুম ও জাতিগত শোষণের জাতা-কলে এই আকাঙ্খা পিষে মারা হচ্ছে। জুলুম ও নিপীড়নের এই সয়লাব নতুন নতুন যুদ্ধ, অশান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে।

জিম্বা, বুই, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশ-গুলো ষড়যন্ত্র, আক্রমণ ও লুটতরাজের শিকার হয়েছে। এজন্য এসব এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে। দুনিয়া দেখছে আগ্রাসী এবং বর্ণ বৈষম্যবাদী শক্তিগুলোই এই অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

নিরুপায় দেশগুলোকে এর মোকাবেলার জন্য তৈয়ার হতে হয়েছে। নিপীড়িত দেশগুলোর জন্য এই মোকাবেলা যে কোন দিক দিয়েই ন্যায় সঙ্গত এবং আইন সিদ্ধ।

জনাব সভাপতি!

দুনিয়ার যে সকল জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উচিত তাদের সাহায্য সহযোগীতা করা। ইন্দোচীনের জনগণ এখনও ষড়যন্ত্র ও হুমকির শিকার হয়ে আছে। ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে এক শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কোরিয়া এখন প্রতীক্ষমান। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের পরামর্শদান সত্ত্বেও এ ব্যাপারে শান্তির কোন মঞ্জিল নজরে আসছে না।

সাইপ্রাসের লড়াই মাত্র কয়েক মাসের ব্যাপার। এ দেশের জন-সাধারণ যে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে চলেছেন সারা দুনিয়া তা অনুভব করছে। আমি এ ব্যাপারে ব্যথিত। এ সম্পর্কেও জাতিসংঘের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত যাতে একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসায় আসা যায় এবং এ অঞ্চলের জনসাধারণের আজাদী হেফাজত হয়।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এক নগ্ন হামলার সামনে এদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে; যার মোকাবেলা বাধ্য হয়েই এদের করতে হচ্ছে, গরীব দেশগুলো স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে তাদের কাছে যে কাঁচা মাল আছে তার লুটতরাজ বন্ধ করতেই হবে। নিজেদের কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য আদায়ের অধিকার তারা পেতে চায়।

এসব দেশের সামনে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে যা বিভিন্ন আন্তর্জা-

-তিক সম্মেলনে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য জাতিসংঘকে এসব দেশের সঙ্গ দিতে হবে। যাতে করে উন্নয়নগামী ও প্রগতিশীল দেশগুলো আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলো ধমক দিয়ে কাঁচামালের লুট চালিয়ে যেতে না পারে।

জনাব সভাপতি!

দুনিয়াব্যাপী যে অস্ত্রপ্রতিযোগীতা চলেছে তাতে দুনিয়ার শান্তি ও জাগতিক সম্পদই শুধু নষ্ট হচ্ছে না, বিশ্বযুদ্ধের হুমকিও সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এই অবস্থায় জরুরী হয়ে পড়েছে আণবিক অস্ত্রকে সীমিত করার এবং আস্তে আস্তে তাকে বিনষ্ট করে দেয়ার। যত সম্পদ এই কাজে ব্যয় করা হচ্ছে তা উন্নয়ণ, প্রগতি ও গঠণমূলক কাজে নিয়োগ করার জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা চালিয়ে যাবে—দুনিয়ার জাতি সমূহ তাই চায়।

আমাদের কথায় আসি। ইসরাইলের অস্তিত্ব আমাদের জন্য অশান্তির কারণ হয়ে আছে। আরবদের উপর ইহুদীবাদ জবরদখলই শুধু করেনি, আক্রমণ ও যুদ্ধের এক ধারা সৃষ্টি করে চলেছে এবং এমনি করে তার সম্প্রসারণবাদ লিপ্সা পূর্ণ করে চলেছে। ধ্বংস ও বিভীষিকার রাজত্ব আরও বাড়ানোর জন্য পঞ্চম বার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এরা।

জনাব সভাপতি!

দুনিয়া এখন শান্তি-সৌহার্দ, বিচার-ইনসাফ, স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য লড়াই করে চলেছে। এজন্য উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও ইহুদীবাদ তথা যে কোন প্রকারেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একযোগে আওয়াজ উঠেছে। দুনিয়ার এই সংগ্রাম জাতিসংঘের নীতির জন্য সংগ্রাম। আজকের দুনিয়ার অবস্থা সকলের সামনেই উন্মুক্ত। জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন ও ইহুদীবাদের অধিকারের মধ্যেও উপনিবেশবাদী ও বর্ণবাদীদের পুরোনো দুনিয়া ভেঙ্গে পড়েছে। এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি হচ্ছে

এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুনিয়ার সামনে যে ইনসাফভিত্তিক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে তার সমাধানের জন্য সহযোগীতা করা হবে এবং আমরা সফল হব।

এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমার এই আওয়াজ এটাই প্রমাণ করবে আমরা শুধু মাত্র রণক্ষেত্রে নয় রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও আমাদের সমস্যার সমাধান করতে চাই। এটাও পরিষ্কার জাতিসংঘ আজ দুনিয়ার সমস্যাগুলো মীমাংসা করার পুরো যোগ্যতা রাখে। অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমানের ঘটনাবলীই নয়, আমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের পানেও নিবন্ধ আছে। কিন্তু বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে আগামীর আওয়াজ তুলতে গিয়ে অতীতের দিকে ফিরে যেতেই হচ্ছে। যাতে দুনিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিগুলোর সঙ্গে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পৌঁছতে পারি।

আর এখন যখন আমি আমার সমস্যাকে তুলে ধরতে চাইছি তার পূর্বাহ্নে একথা জানিয়ে দিতে চাই, এখন এখানে এমন সব লোকও উপস্থিত আছে যারা আমাদের ঘরে বসবাস করছে, আমাদের ক্ষেতের ফসল তুলছে, আমাদের গাছের ফল খাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ওদের কথা হচ্ছে আমাদের কোন অস্তিত্বই নাই, আমরা শুধুমাত্র পরগাছা। না আছে আমাদের কোন জমি জায়গা আর না আছে আমাদের কোন ভবিষ্যত। কিছু কিছু এমনও লোক আছেন যারা হয়ত ভাবেন এ এক উদ্বাস্তু সমস্যা এবং আমরা আমাদের জন্য এমন সব অধিকার চাইছি যার হকদার আমরা নই। তারা ভাবেন এরা আইনসঙ্গত ও সন্তোষ-জনক কারণ ছাড়াই অন্যদের ভীতি ও সন্ত্রস্ত করার জন্য যুদ্ধ করে চলেছে।

এখানে মার্কিনী ও অমার্কিনী এমন সব প্রতিনিধি আছে যারা আমাদের শত্রুকে যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করেছে, গোলাগুলি তথা হত্যা ও ধ্বংসলীলার সাজ-সরঞ্জাম জুগিয়ে যাচ্ছে। এমনি করে আমাদের সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার করছে এবং আমাদের আসল সমস্যা বিকৃত করে দুনিয়ার সামনে পেশ করছে। আর এ সবের জন্য যে লোকসান হচ্ছে

আজাদীপ্রিয় আমেরিকাবাসীকে তা বরদাস্ত করতে হচ্ছে। আমি এই অমূল্য সময় নষ্ট না করে এখান হতেই আমেরিকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইঃ তাঁরা মৃত্যু ও ইনসাফের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের বীর জাতিকে তাদের সমস্যা সমাধানে সহযোগীতা করবেন। আমেরিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে গেছেন সেই মহান জর্জ ওয়াশিংটন, আমেরিকাবাসী নিশ্চয়ই তা ভুলে যাবেন না। আমি আমেরিকা বাসীদের জিজ্ঞেস করতে চাই আমাদের এই ব্যাপারে আমেরিকা আমাদের শত্রুতামূলক ব্যবহার কেন করছে? এটা কি আমেরিকার জন্য লাভজনক? আমেরিকার জনগণের জন্য লাভজনক? কখনই তা নয়। আমার বিশ্বাস আরব দেশগুলোর সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্ব অধিক গুরুত্ব পূর্ণ। এই বন্ধুত্ব অধিক মজবুত ও লাভ জনক হবে।

জনাব সভাপতি!

ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার সময় যে বুনিয়াদী গলদের কারণে দুনিয়ার অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়ে চলেছে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

আমাদের সমস্যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে শুরু হয়েছে। অন্য কথায় ঔপনিবেশবাদের নয়া নয়া দখলদারীর আমলেই এর ভূমিকা। এই সময়েই ফিলিস্তিনের উপর হামলা করার জন্য ইহুদীবাদীরা পরিকল্পনা তৈরী করে। ইউরোপ থেকে ইহুদী দেশ ছেড়ে ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। এই যুগেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া নয়া হামলা চলছিল। এই তিন মহাদেশে আগ্রাসন ও লুটতরাজ চলতে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ফিলিস্তিনে এর চেহারা এখনও দেখা যাচ্ছে। ফিলিস্তিন দখল করার জন্য ব্যাপক আকারে ইহুদীদের দলে দলে আগমন অব্যাহত থাকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বর্ণ, জাতি, ভাষার ভিত্তিতে আফ্রিকার দেশগুলোতে আগ্রাসন চালিয়ে গিয়েছিল। একইভাবে ফিলিস্তিনেও লুটতরাজ চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের ঘর থেকে বের

করে দিয়েছে।

এখন ইহুদীরা বলছে যে, তাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা হতে এসে অন্য একটি জাতির ভূমিকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমি করে নেবে। এটা ঠিক সেই নীতি, যে নীতি জার্মেরা অনুসরণ করেছিল। এই জন্য যোয়েস এবং হারতাজালের চিন্তা ও কার্য-কলাপে সমতা পরিলক্ষিত হয়, কেননা যোয়েস দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকায় সাদামানুষের উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিল, আর হারতাজাল ব্রিটেনের সাহায্যে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে বসবার পরিকল্পনা তৈরী করে। এইভাবে ইহুদীরা আমাদের দেশে আক্রমণ চালানোর জন্য নানা ভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ফিলিস্তিনের কিছু সত্য উদঘাটন করার জন্য আপনাদের অনুমতি চাইছি।

১৮৮১ সালে, যখন পাশ্চাত্য দেশ হতে প্রথম ইহুদীরা আসতে শুরু করে তখন ফিলিস্তিনের জনসংখ্যা ছিল মোট ৫ লক্ষ। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান। কিছু খৃষ্টান এবং প্রায় বিশ হাজারের মতো ইহুদী—এরা সবাই আরবী। এরা ছিল প্রতিবেশী। এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল। ছিল ভালবাসা। আমাদের ভূমি ছিল শান্তিপূর্ণ। এরপর ইহুদীচক্র পাশ্চাত্য দেশ হতে ৫০ হাজার ইহুদীকে এনে প্যালেষ্টাইনে বসাবার সিদ্ধান্ত নিল। এই সমস্ত ইহুদীরা ১৮৮২ হ'তে ১৯১৭ পর্যন্ত উদ্বাস্তু হিসেবে এসে বসবাস করতে থাকে। ব্রিটেনের বেলফোর ঘোষণার সাহায্যে তারা সেখানে বসবাসের সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ৩০ সাল ধরে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদীদের পাঠিয়ে দেওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকল। ক্রমশঃ এই ভাবেই ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে এসে আমাদর মাতৃভূমি দখল করতে থাকল। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬ লাখ এবং ঐ সময় আরবদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ আর ঐ ১৯৪৭ সালেই কয়েকটি রাষ্ট্রের সহায়তায় এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের চাপে রাষ্ট্রসংঘ ঐ ইহুদীদের জন্য পৃথক ভাবে মাতৃভূমি বণ্টন করে দেন।

(· এর পরে তিনি হজরত সোলেমানের বিচারের ঘটনার উল্লেখ করেন।)

ফিলিস্তিনের ৫৪% জায়গায় এই বহিরাগত ইহুদীদেরকে দিয়ে দিল। কিন্তু ইহুদীরা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ৮১ শতাংশ দখল করে নিল। ১০ লাখ আরব বাসিন্দাকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দিল। ৫২৪টি শহর ও গ্রামকে দখল করে নিল এর মধ্যে ৩৮৫টি শহর ও গ্রামকে একেবারে ধ্বংস করে দিল। এই ভাবে আমাদের ক্ষেতে, বাগানে ও বসতিতে নতুন নতুন আবাদী সৃষ্টি করল এখান হতেই ফিলিস্তিন সমস্যার শুরু।

ফিলিস্তিনের সমস্যা দু'একদিনের কিংবা দুটো জাতির মধ্যকার কোন সমস্যা নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সংঙ্গে সংঘর্ষের সমস্যা মাত্রই এটা নয়। এটা এমন এক জাতির সমস্যা যাদেরকে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদেরকে ক্যাম্পে জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়েছে।

ইহুদীরা উপনিবেশবাদী শক্তির সাহায্যে চেষ্টা করে চলে যাতে ফিলিস্তিন জাতিসংঘের সদস্যপদ না পায়। এভাবে বিশ্ব-জনমতকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ করে নিল। এদের সহযোগিতায় প্রচার করতে থাকল আমাদের সমস্যা উদ্বাস্তসমস্যা, আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা দরকার এবং আমাদিগের অন্য দেশে বসবাস করার সুযোগ করে দিতে হবে।

ইহুদীবাদীরা একদিকে এধরণের প্রোপাগাণ্ডা চালাতে লাগল অন্য দিকে উপনিবেশবাদী শক্তির সাহায্যে—অস্ত্র সংগ্রহ করে আগ্রাসনের মাধ্যমে নিজেদের এলাকা বাড়াতে লাগল। প্রতিবেশী দেশগুলো শত-সহস্রবার এদের আগ্রাসী নীতির শিকার হয়েছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালে তাদের সম্প্রসারণবাদ চরিতার্থ করার জন্য যে নগ্ন হামলা করা হ'ল তা দুনিয়া কেবল দেখলই না, বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৯৬৭ সালের হামলায় ফিলিস্তিনি এলাকা ছাড়িয়ে লেবানন, মিশরের সুয়েজ এবং সিরিয়ার গোলান এলাকাও

ল করে বসল। এতে করে এই এলাকায় এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। আর এটাকেই মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা বলা হচ্ছে। ইসরাইলের সমস্যাকে জিইয়ে রাখার অর্থ আরবের মাথায় এক আন্তর্জাতিক হুমকি চাপিয়ে রাখা। আগ্রাসনবাদকে খতম করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সাধারণ পরিষদে যে সব সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল তা ইসরাইল অগ্রাহ্য করে চলেছে।

শান্তির কোন চেষ্টাই সফল হল না। এই পরিস্থিতিতে ইহুদীবাদের সম্প্রসারণকে রোধ করার জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া আরব দেশগুলোর বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়ার আর কি উপায় । দখলীকৃত এলাকা উদ্ধার ও ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার আদায় এই একটি মাত্র পথ বাকী ছিল। এভাবেই ইসরাইল বুঝতে পারে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অবলম্বনে সম্প্রসারণবাদ এক ভুল রাজনীতি। কিন্তু এখন অবধি ইসরাইলের এ হুঁশ হচ্ছেনা। পঞ্চম বার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যাতে আরবদের সঙ্গে জোর গলায় আলোচনা চালাতে পারে।

জনাব সভাপতি!

আমাদের দেশ মরুভূমি ও বিরান ছিল। ইহুদীরা এসে তা আবাদ করেছে—ইহুদীবাদীদের এই প্রোপাগাণ্ডা শুনে আমাদের দেশবাসী দুঃখিত হয়। বিশ্বসংস্থার সদস্যদের এই মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার গতিরোধ করতে হবে। ফিলিস্তিন তাহজীব ও তমুদ্দুনের অতি প্রাচীন নিদর্শনের সমৃদ্ধ, হাজার বছর ধরে আমাদের জাতি এই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ফিলিস্তিন বিশ্বের স্বাধীনতা ও পবিত্র জায়গা সমূহের নিদর্শন স্বরূপ ছিল। এখানে সহনশীলতা ও স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। ইসরাইলী জবর দখলের পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাসে ভ্রাতৃত্বের যে উন্নত আদর্শ পরিবেশ ছিল তার ছবি এখনও আমাদের মানসপটে অঙ্কিত আছে। ইসরাইল একে অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত করতে চাইলেও বায়তুল

মোকাদ্দাসের এক সুযোগ্য সন্তান হিসেবে এটা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে দিতে চাই, মানবীয় ভ্রাতৃত্বের এই অতুলনীয় নমুনাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তা ফিরিয়ে আনবই। ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের হাতে তুলে দেয়া হবে না।

আমরা পিতৃপুরুষের উত্তারাধিকারকে ছেড়ে দিতে পারি না। দেশ ও জাতির এই ঐতিহ্যকে আমরা টিকিয়ে রাখবই। ইসরাইল জাতি-বৈষম্যের প্রবক্তা; উপনিবেশবাদীদের মিত্র ও সহযোগী। একটু স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই দেখা যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, এ্যাঙ্গোলার বর্ণবাদীদের সঙ্গে এদের গভীর যোগাযোগ আছে। এ থেকেই পরিস্কার হয়ে যায় আমাদের সংগ্রাম সম্প্রসারণবাদীদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের দেশকে জবর দখল করেছে। আর আমরা চেয়ে আছি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে। যেখানে আমাদের শত্রুরা আমাদের অতীতকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

জনাব সভাপতি!

ইহুদীরা যদি এমনি উদ্দেশ্য নিয়ে হিজরত করে আসতেন যে, এখানে এসে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে আর্মেনীয় ও তুর্কীদের মত ভাইয়ের ন্যায় বসবাস করতে চায় তাহলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশকে কেড়ে নিয়ে আমাদেরকেই এখান থেকে বিতাড়িত করবে, না হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিবর্তিত করে দেবে। আমরা এটাকে কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারি না। তাই আমাদের আন্দোলনে জাতিবৈষম্যের কোন গন্ধ নেই; না আছে এতে ইহুদীদের প্রতি কোন শত্রুতা। আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন জাতি বৈষম্য ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের আন্দোলন মানবীয় সভ্যতার আন্দোলন। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান একই অধিকার নিয়ে বসবাস করবে। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে কোন বিভেদ করা হবে না।

জনাব সভাপতি !

আমরা ইহুদীবাদ Zionism ও ইহুদীয়াতের সঙ্গে পার্থক্য করি। ইহুদীবাদ সম্প্রসারণবাদের এক বিশেষ চেহারা। এই জন্য আমরা এর বিরোধিতা করি। কিন্তু ইহুদী ধর্মের কথা উঠলে আমি জানিয়ে দিতে চাই আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি এবং আমাদেরই এক উত্তারাধিকার মনে করি। এক শতাব্দী পূর্বে ইহুদীবাদ কাজ শুরু করেছে। কিন্তু আজ তা খোদ ইহুদীদের জন্য আরবদের জন্য ও শান্তিকামী দুনিয়ার জন্য এমন এক বিপদ সৃষ্টি করে চলেছে যা থেকে কোন মতেই দৃষ্টি সরিয়ে রাখা যায় না।

এই সুযোগে আমি সকল জাতি ও রাষ্ট্রকে ইহুদীদের অনাগত দেশ-ত্যাগ আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি—আকর্ষণ করছি। এ আন্দোলন আমাদের দেশকে গ্রাস করার জন্য চলছে। জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে দুনিয়ার কোথাও যাতে বিভেদ না করা হয় সেদিকেও সকলের মনোযোগ দেয়া দরকার।

জনাব সভাপতি !

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আরবদের এই মূল্য দিতে হচ্ছে কেন? ইহুদীদের হিড়িক আমাদের দেশেই কেন এসে পড়ছে? এর পরেও কারুর মনে কোন সংশয় বাকী থেকে থাকলে আমি তাঁদের বলে দিতে চাই, ঐ দেশত্যাগীদের জন্য তাদের বড় বড় দেশের দরজা কেন খুলে দেন না?

জনাব সভাপতি !

তারা আমাদের ন্যায় ইনসাফের আন্দোলনকে অন্যায় ও অবিচার বলে দেখাতে চায়। যারা—ইহুদীবাদ ও সম্প্রসারবাদের কবল হতে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে তাদের কোন মতেই সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয়া যায় না। আমেরিকা যখন বৃটেনের অধীনতা হতে মুক্ত হবার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল, যখন ইউরোপ নাৎসীবাদের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তাকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেয়া হয়নি। তাই এশিয়া আফ্রিকা ল্যাতিন আমেরিকার জনগণের আজাদী সংগ্রামকে সন্ত্রাস আন্দোলন বলা যায় না।

জনাব সভাপতি!

এ আন্দোলন সন্ত্রাস সৃষ্টির আন্দোলন নয়। এ ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাও এটা স্বীকার করে। যারা অপরের দেশ আক্রমণ করে লুটতরাজ করার জন্য হাতিয়ার হাতে নেয় তারাই আসলে সন্ত্রাসবাদী। এরাই ভর্ৎসনার যোগ্য। সব অস্ত্র ধারণকারীই অপরাধী নয়। যারা অন্যের আজাদী হরণ করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে তারাই অপরাধী। নিজের ও নিজের দেশের মুক্তির জন্য হাতিয়ার ধারণকারী অত্যাচারী নয়, দেশের বীর মুজাহিদ। সন্ত্রাসবাদী আমরা নই, যারা হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে ভেড়া ছাগলের মত হত্যা করেছে তারাই আসল সন্ত্রাসবাদী। ওদের সন্ত্রাসবাদ হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে গৃহহীন করেছে এবং প্রিয় শহর বায়তুল মোকাদ্দাসকেও দখল করেছে। তারা আরব, ইসলামী, ঈসায়ী চরিত্রকে বদলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। মসজিদে আকসায় অগ্নি সংযোগ ও ক্যানসিয়ার চুরি এর জলন্ত প্রমাণ। আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘ করতে চাই না; কিন্তু এটা অবশ্যই বলতে চাই-তাদের এসকল প্রয়াস সন্ত্রাসবাদের প্রমাণ বহন করছে। তাদের সন্ত্রাসবাদ জনগণের ক্ষতিই শুধু হচ্ছে না, সভ্যতা সংস্কৃতিরও অপূরণীয় ক্ষতি হ'তে চলেছে।

বায়তুল মোকাদ্দাস তিন আসমানী ধর্মের মিলন ভূমি। কিন্তু আজ ভবিষ্যতের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ইহুদীদের সন্ত্রাসবাদের এটাই শেষ কথা নয়—তাদের এই সন্ত্রাসবাদে দখলীকৃত আরব ভূমি দিন রাত হয়রানী হয়ে আসছে। মিসরের কলেজ, কারখানার প্রতি বোমাবর্ষণ, লিবিয়া বিমান বন্দরে ধ্বংসসাধন, সিরিয়া কাস্তারা বিনাশ কি ইহুদী সন্ত্রাসবাদের উজ্জ্বল প্রমাণ নয়? ইহুদীদের এই সন্ত্রাসবাদ সকলেই

খালিচোখেই দেখতে পাচ্ছে। লেবাননে ইহুদী সন্ত্রাসবাদ এক লোমহর্ষক ঘটনা হয়ে রয়েছে। লেবাননে ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ। এ পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা স্বাধীনতা সংগ্রামের আইনতঃ অধিকারী। এর পেছনে ফিলিস্তিনী জনসাধারণ তাদের সংগঠন এবং সমগ্র আরব জগতের সমর্থন রয়েছে। আরব শীর্ষ সম্মেলন ও ফিলিস্তিনের উপর ফিলিস্তিনীদের অধিকার সমর্থন করেছে। ফিলিস্তিনীদের এই মুক্তি সংগ্রামে দুনিয়া অন্যান্য অঞ্চলের আজাদী আন্দোলনগুলোও সমর্থন করেছে। এখানে আমি অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি—গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশসমূহ, কম্যুনিষ্ট দেশসমূহ এবং ইসলামী দেশগুলো আফ্রিকার দেশসমূহ এবং ইউরোপের বন্ধু দেশগুলো আগেকার দেশ ও জাতির এই সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। আমাদের সংগ্রামে তারা আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের মুক্তি সংস্থা ফিলিস্তিনী জাতির প্রতিনিধি এ অধিকার নিয়েই আমি ফিলিস্তিনীদের মুক্তির আকারকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ফিলিস্তিনী সমস্যার ব্যবস্থা আপনাদের উপর ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

জনাব সভাপতি !

আমরা বিপ্লবী, স্বাধীনতা পীপাসু এই সভাকক্ষে যারা বসে আছে, তাদের অনেকেই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মতই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। তাদের সৌভাগ্য যে তাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি আমরাও ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য এই যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি তা ন্যায় সঙ্গত কিনা ? আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময় বলেন, "আমি বিচ্ছিন্নতা বাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি ফিলিস্তিনে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।" এই নির্ভীক ইহুদীবীর, "আহোদরি" তাঁর সঙ্গীসহ আজ ইসরাইলের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে দিন অতিবাহিত করছেন আমি সেই বন্দী বীরকে এইখান থেকেই শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা জানাই। শুধু তাই নয়

ইসরাইলের খৃষ্টান চার্চের এক পুরোহিত স্পষ্টভাবে সরকারের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লেশ চেষ্টা করে চলেছেন, যে-এই শান্তিময় ভূমিতে সবাই শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারে আমার আশংকা এই মহান নেতাকেও অচিরে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হবে। আমি তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞ মোবারকবাদ পেশ করছি।

আমরা সবাই একই পথের পথিক। আমরা সবাই আশা আকাঙ্খাকে এক নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করছি। আমি আমার জাতির সঙ্গে নিজেদের মাতৃ ভূমিতে ফিরে এসে এই ইহুদী বীর ও খৃষ্টান পুরোহিত নেতা এবং তাঁর ভাইদের সঙ্গে এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় জীবন অতিবাহিত করতে চাই। এই রাষ্ট্রে ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান ভায়েরা শান্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায় বিচারের মধ্যে বসবাস করবে। আমি ফিলিস্তি মুক্তি সংস্থার নেতা এবং এক বিশিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আজ আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, যখনই আমি আমাদের কোন আশা আকাঙ্খা এবং বাসনার কথা বলেছি এর মধ্যে আমার এই সব ইহুদী ভায়েরাও রয়েছে যারা আজও আমাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনে থেকে আমাদের আশা-আকাঙ্খা রূপায়নে সহযোগিতা করে চলেছে। এবং কোন বর্ণ ও ধর্ম বৈষম্য ব্যতিরেকে আজও তারা আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে আগ্রহী। ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ইহুদী ভাইদের আমি আনুরোধ করছি, ইহুদী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদেরকে ধ্বংসের যে ভয়াল পথে নিয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এর উপর যেন তাঁরা চিন্তা করেন। বর্তমান ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ এক অনন্ত যুদ্ধ এবং ধ্বংসের পথ। এই সাম্রাজ্যবাদীরা আপনাদেরকে এই যুদ্ধাগ্নির ইন্ধন বানাতে চায়, অপরপক্ষে আমি আপনাদেরকে ফিলিস্তিন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জীবন যাপনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নেতা হিসেবে আমি আপনাদের কাছে ঘোষণা করছি। ফিলিস্তিনে শান্তি এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবার

পর কোন কোন ইহুদী কিংবা আরবের রক্তপাত আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নেতা হিসেবে আমি আজ আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের এই মুক্তির ন্যায় সংগ্রামে সর্ব প্রকারে সহযোগিতা করুন। আপনার এই আন্তর্জাতিক সংস্থাও বিভিন্ন সময়ে আমার এই কথার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আপনাদেরকে পরভূমি ছেড়ে নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে দেয়া হোক নিজের বাড়ী-ঘর ক্ষেত-খামারে আমরা আবার ফিরে স্বাধীনতা স্পর্শ পাই। আমাদের অধিকার আমরা যেন প্রাপ্ত হই। পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস যেন আমরা আবার ফিরে পেয়ে আমাদের এই যাত্রায় পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের রক্ষী হয়ে অগ্রসর হতে পারি। আর দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মের এই কেন্দ্রস্থল পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস যেন সন্ত্রাস হ'তে মুক্ত হয় যেমনটি পূর্বে ছিল।

জনাব সভাপতি !

আমি একহাতে শান্তির পাত্র এবং অন্য হাতে বিপ্লবের বন্দুক নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। এখন এটা আপনার দায়িত্ব আপনি যেন আমার হাত হতে এই শান্তির পাত্র পতিত হ'তে না দেন।

জনাব সভাপতি !

জেনে রাখুন ফিলিস্তিন হতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ শিখাও উত্থিত হতে পারে আর নির্গতও হতে পারে শান্তির আমির ধারা।

• • •

ইয়াসির আরাফাত মানে ফিলিস্তিন, আর ফিলিস্তিন অর্থাৎ আরাফাত। দু'জনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। পি, এল, ও,র সামগ্রিক গতি প্রবাহিত হচ্ছে আরাফাতের অঙ্গুলি নির্দেশেই। কিছুদিন পূর্বে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন তৎপরতা সম্পর্কে বিষদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। তার মতে :—

ফেদায়ীন তৎপরতা :—বিদেশে ইসরাইল এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা কিছু সুফল পেতে পারে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য

রাজনৈতিক আলোচনা এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

ইসরাইলী রণনীতি ঃ—প্যালেষ্টাইনী জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে ইহুদী-মার্কিন তৎপরতা চলছে। এ বিশ্ব হয়তো জানেনা যে, ইসরাইলীরা পশ্চিম তীরে ৮৮০০টি বাড়ী এবং 'গাজা' এলাকায় ১০০০ বাড়ী ধূলিস্যাত করে দিয়েছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনী জনগণ নিশ্চিহ্ন হতে রাজী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো এরা ভাগ্যকে মেনে নিতে পারবে না।

মার্কিন নীতি ঃ ২৫ বছর ধরে আমেরিকা ইসরাইলকে সমরাস্ত্রসহ সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। এই এলাকায় ইসরাইলদের পক্ষে মার্কিন সমর্থন ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন সাধিত করেছে। কিন্তু এই ভারসাম্য তারা আর কতদিন বজায় রাখতে পারবে?

মধ্যপ্রাচ্য ঃ—মধ্যপ্রাচ্য প্রসঙ্গে আরাফাত আরো দুঃখ কষ্ট এবং ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না। তাঁরা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জয়ী হওয়া এক উন্মত্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। এমন একটি শত্রুর মোকাবেলা করছে, যে প্যালেষ্টাইনী জনগন, নেতা এমনকি নারীদের হত্যা করতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল।"

ইসরাইল এক সময় পরিকল্পনা করেছিল সিনাই দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে প্যালেষ্টাইনীদের পুনর্বাসিত করার জন্য। কিন্তু ফিলিস্তিনীরা তা মেনে নিতে চায়নি। হতে পারে তারা উন্নততর জীবন যাত্রার জন্য আর অভিলাষী নয়, তা'ছাড়া 'গাজাতে' স্থায়ী চাকরী-বাকরীও পাওয়া যায়; কিন্তু তাতে যদি ফিলিস্তিনীদের মনে হয় যে, মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন তাদের জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে, তাহলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে তারা নির্বিকারে। সিনাইতে স্থায়ী চাকরী এবং গাজায় বেকারত্ব—এই দু' পক্ষের একটিকে বেছে নিতে বললে তারা নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করবে। ফিলিস্তিনীদের এই মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে আর্নল্ড টয়েনবী যাদুকরী ভাষায় তিনি বলেছেন: "ত্যাগ তিতিক্ষাই

তাদের প্রাণ। স্তম্ভ ধ্বসিয়ে হলেও তারা চায় ইসরাইলী দুশমনের মাথায় ছাদটা ধ্বসিয়ে নামাতে।'

প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রামের একজন অন্যতম প্রধান সমর্থক ও সাহায্য-দানকারী মহান ব্যক্তি ছিলেন ১৯৭৪-এর 'শ্রেষ্ঠ মানব' শহীদ বাদশাহ্ ফয়সল। সৌদী আরব গোড়া থেকেই প্যালেষ্টাইনের মদদ জুগিয়ে এসেছে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্যালেষ্টাইনের গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাদশাহ্ ফয়সল আশা প্রকাশ করেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি পবিত্র মসজিদ, জেরুজালেমের "বায়তুল মোকাদ্দাসে" নামাজ পড়তে চান। তিনি বলেন, জেরুজালেমের মুসলমানদের মুক্তির দায়িত্ব শুধু প্যালেষ্টাইনীদেরই নয়, সম্মিলিত আরবশক্তিবর্গের এটি পবিত্র কর্তব্য। আরব জাহানের একাত্মতা ভিন্ন এ' দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কিছু দেশে তেল সরবরাহ বন্ধও নিয়ন্ত্রণ করবার যে পদক্ষেপ আরব নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন, বাদশাহ্ ফয়সল ছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। আরবদের তেল অস্ত্র প্রয়োগের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরব তেল খনি-সমূহ সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকী কিসিঞ্জার দিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট জেরাল্ড ফোর্ডও একই সুরে সুর মিলিয়ে ছিলেন। কিন্তু সামরিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যদি এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করতে চায়, তাহলে বিশ্ব জুড়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জয়েণ্ট চীফ অব ষ্টাফের সাবেক এডমিরাল এলমো জাম ওয়ার্ল্ট মন্তব্য করেন, "মধ্য প্রাচ্যের তেল খনি দখলের শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নেই। যুক্তরাষ্ট্র যদি এ ধরণের ঝুঁকি নিয়ে বসে, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নও বসে থাকবে না।" প্যালেষ্টাইন নেতা ইয়াসির আরাফাতও একই বক্তব্য পেশ করেছেন। আমেরিকা শেষতক মধ্য প্রাচ্যের এই ঝুঁকি গ্রহণে এগোবার সাহস করেন। আরাফাত বাদশাহ্ ফয়সলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭৩ সালের ২১ শে ডিসেম্বর মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে প্যালেষ্টাইনীদের তরফ থেকে জেনেভায় যোগদান করতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু ইসরাইলের ঘোরতর বিরুধীতার ফলে তিনি আলোচনায় যোগ দিতে পারেন নি।

এ ধরণের প্রেক্ষাপট থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইয়াসির আরাফাত বা প্যালেষ্টাইন মুক্তি-আন্দোলন শুধু মাত্র রণ-ক্ষেত্রের অগ্নিঝরা পথ বেয়েই প্রবাহিত নয়, এঁরা শান্তির পথেও প্রবাহিত হতে চান ; পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেও ইয়াসির আরাফাত তাঁর ইপ্সিত আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে আগ্রহী, কিন্তু মাঝপথে কণ্টক হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইসরাইলের অনমনীয় কঠোর ও একমুখী মনোভাব ; যে জন্য শুধু প্যালেষ্টাইন নয় ; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব জাহানের মূল সমস্যা অধিকৃত 'আরব ভূমি'র কোন সমাধান আজতক হয়ে উঠেনি। অন্যদিকে ইসরাইলের একনিষ্ঠ সাহায্যদানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র মানবতার প্রশ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কিত সকল প্রস্তাবকে অকপটে নাকচ করে দিচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বে জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে শতাধিক রাষ্ট্র এক বাক্যে প্যালেষ্টাইনীদের ভূমি তাদের ফিরিয়ে দেয়াসহ ফিলিস্তিনীদের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রস্তাব পাশ করেন। বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জনমত ইসরাইলের আগ্রাসী নীতিকে চরমভাবে অবজ্ঞা করেছেন। প্যালেষ্টাইনীদের ন্যায্য অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী মানুষই প্যালেষ্টাইনীদের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইয়াসির আরাফাত এবং প্যালেষ্টাইনী জনসাধারণের সংগ্রাম আজও অব্যাহত আছে ; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে সংগ্রামের গতিময়তা। সম্প্রতি ফিলিস্তিনীরা একটি শহরও দখল করেছেন। প্যালেষ্টানীদের ন্যায় অধিকার এড়িয়ে যাওয়া যে অসম্ভব, তা এখন প্রমাণিত সত্য। প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংস্থা আজ বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে প্যালেষ্টাইনী জনগণের এক মাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত। প্যালেষ্টাইন ইস্যু আজ আর আরব

বা মধ্য প্রাচ্যের আঞ্চলিক সমস্যার ব্যাপার নয় ; এ'টি এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা। সমগ্র বিশ্বের শান্তির স্বার্থেই এর দ্রুত সমাধান আশু-প্রয়োজন। আর এ' কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, এই সমাধান হচ্ছে ইসরাইলের পরিবর্তে স্বাধীন সার্বভৌম প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন এবং তার প্রতি সকলের স্বীকৃতি।

১৯৭৪ সালের ১২ই নভেম্বরে জাতিসংঘের বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আরাফাত যে কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিমত "হত্যায় আমরা বিশ্বাস করিনা। কিন্তু হত্যা এবং সন্ত্রাস সেদিনই বন্ধ হবে, যে দিন ৪০ লক্ষ ছিন্ন মূল প্যালেষ্টাইনী তাদের ন্যায্য অধিকার এবং আশা-আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ন ঘটাতে পারবে।"

কিন্তু ইয়াসির আরাফাতের এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকেও ইসরাইলের কোন কার্যকরি প্রতিক্রিয়া সংসাধিত হয়নি। ইসরাইলের প্রভূ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারো হুমকী দিয়েছে। প্যালেষ্টাইনীদের দখলীকৃত ভূমি ফিরিয়ে দেবার যে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদান করবে।

প্যালেষ্টাইনের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য এখনো সুদূর পরাহত। যুদ্ধের মাধ্যমে এই সমস্যা সহজেই মিটে যাবার নয়। তাহলে প্যালেষ্টাইনের আগামী লক্ষ্য পথ কি হবে? ইয়াসির আরাফাত এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু দিন পূর্বে যে বক্তব্য রেখেছিলেন; তা অবশ্যই সুষ্ঠু গঠনমূলক অভিমত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন: "আমরা কম্যাণ্ডো আক্রমণকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োগ করি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের জনগণের টিকে থাকা নিশ্চিত করা; তারা যেন তাদের বাড়ী-ঘর ফিরে পায় এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা। আমরা যখন দেখি, পৃথিবীর যে কোন দেশের লোক ইসরাইলে বসতি স্থাপন করতে পারেন; কিন্তু আমাদের সেখানে যেতে দেয়া হয় না; তখন আমাদের কেমন অবস্থা হয় ভেবে দেখেছেন? ………ইসরাইল যদি পৃথিবীর

এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে সত্যিই আগ্রহী হয়, তাহলে লেবাননের মত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যেখানে ইহুদী খ্রীষ্টান এবং মুসলমানরা এক সঙ্গে বসবাস করতে পারে—তার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটাই হবে সর্বোত্তম এবং আদর্শ সমাধান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের ইসরাইলের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনার প্রয়োজন আছে।''

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আরাফাতের এই বক্তব্য তাঁদের ভূমি-ফিরে পাবার প্রচেষ্টায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিমত।

চিরঞ্জীব বাদশাহ ফয়সল

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে শান্তিকামী জনগোষ্ঠি চিরকালই পর্যুদস্ত ও নিপীড়িত। প্রাচীনকালে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আরব দেশসহ বিভিন্ন দেশে যে নীতিটি প্রচলিত ছিল, তা হচ্ছে "জোর যার মুলুক তার।" শক্তিই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হবার মূল চাবিকাঠি, মানবতা ও ন্যায় নীতির কষ্টিপাথর মদমত্ত শক্তির কাছে নিষ্প্রয়োজন ও হাস্যকর। সভ্য মানুষ বিশ্বাস করে, এ ধরণের প্রকৃতি ছিল মধ্যযুগেরও পূর্বকালীন; কিন্তু বর্তমান যুগেও এই মানসিকতার পরিপূর্ণ উপস্থিতি লোপ পায়নি।

ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রই আটকোটি জনতা অধ্যুষিত এক বিশাল আয়তনের সামগ্রিক শক্তিকে পদদলিত করে মানবতার চরম অবমাননা করছে। সে প্যালেস্টাইনীদেরই শুধু ঘর-ছাড়া করেনি, বিতাড়িত করেনি; মিসরের গোলান উপত্যকা, সুয়েজখাল তীরবর্তী অঞ্চল গাজা ইত্যাদি এলাকাসহ সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডানের বিস্তৃত অঞ্চল জোর পূর্বক অধিকার করে আছে। মিসরসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসমূহ ১৯৬৭ সালের জুন এবং ১৯৭৩ অক্টোবর যুদ্ধে চেষ্টা করেছে হারানো ভূমি পূণরুদ্ধারের, কিন্তু পরিণাম খুব ফলপ্রসূ হয়নি। উল্টো অধিক ভূমি হারাতে হয়েছে আরব দেশগুলোকে।

আরবগণ অতঃপর হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করলেন 'তেল' সম্পদকে। কিন্তু তাতেও কাঙ্খিত সূর্যোদয় ঘটেনি। ১৯৭৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর মিসর জেনেভা শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয়। কিছু কিছু আরব রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করলেও লিবিয়া, সিরিয়া এবং ইরাক সম্মেলনে যোগদান থেকে বিরত থাকে। ইসরাইলের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতায় আসার ব্যাপারে ডঃ কুর্ট ওয়াল্ড হেইমের

সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম দিনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার বলেন, "সুয়েজখাল ফ্রন্ট হতে আরব ও ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার হবে মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনের প্রথম কাজ।" তিনি আশা প্রকাশ করেন, এর ফলে মধ্যপ্রাচ্য বিরোধ দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার পথ সুগম হবে। সম্মেলনে যোগদানকারী সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকো বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে না আসলে সারা বিশ্বের ভাগ্য বিপন্ন হয়ে পড়বে। সম্মেলনে যে দলিল গ্রহণ করা হবে, উহাতে ১৯৬৭ সালে অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেয়ার জন্য ইসরাইলকে অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।" কিসিঞ্জার আশ্বাস দেন, ইসরাইলী বাহিনী চলতি বছর (১৯৭৩) শেষ হবার পূর্বেই ২২শে অক্টোবরের যুদ্ধ-বিরতি রেখায় ফিরে যাবে।

ডঃ কিসিঞ্জারের অন্য সব আশ্বাস বাস্তবায়িত না হলেও দুই পক্ষের সৈন্য অপসারণের চুক্তি রূপায়িত হয়েছে। আপাততঃ মিসরের সঙ্গে ইসরাইলের মোটামুটি শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বেশ সুস্পষ্ট; কিন্তু আরব এলাকা ছেড়ে দেবার কিংবা প্যালেষ্টাইনকে মেনে নেবার কোন ইচ্ছে ইসরাইলের নেইতো বটেই, পরন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার সদম্ভে বলেছিলেন, "জেরুসালেম 'অবিভক্ত থাকবেই এবং তা' ইসরাইলের রাজধানীও থাকবে।" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ানও বলেছেন, "জেরুসালেমসহ দখলীকৃত আরবভূমি সম্পূর্ণ ছেড়ে আসার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তবে হাঁ, শান্তির খাতিরে ছাড়লে একটু আধটু ছাড়া যেতে পারে, এর বেশী নয়।" অন্য এক ইহুদী সমর নায়ক জেনারেল হাইম হার্জগ বলেছেন,—"শান্তি সম্মেলন বছর খানিক চলতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি ফয়সালা হবার সম্ভাবনা নেই।"

এই হল ইসরাইলী নেতৃবৃন্দের অভিসন্ধি। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে, শান্তির প্রশ্নেও ইসরাইল সম্পূর্ণ নমনীয় হবে না।

মধ্যপ্রাচ্যের এই পরিস্থিতির প্রতি সবচে' প্রখর দৃষ্টি রাখছিলেন যে

লোহ মানব, আরবদের ন্যায় সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছিলেন যে অতিমানব; তিনি হচ্ছেন সৌদী-বাদশাহ, ফয়সল, ১৯৭৪ এর 'Super man'; বিশ্বের সেরা ব্যক্তিত্ব, ফয়সল। আরব স্বার্থে সর্ব প্রথম তিনিই তেল সম্পদকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর হয়তো এই কারণেই তাঁকে শহীদ হতে হলো, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু বিসর্জন দিতে হলো।

বাদশাহ ফয়সল ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইবনে সউদ তখনো আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হননি। ইসরাইল বা আরবে তখনো তেলের অস্তিত্ব অনুভূত হয়নি। ফয়সল ছোটকাল থেকেই ছিলেন সংযমী, পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী। ইংরেজী তুর্কী ও ফরাসী ভাষায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর বয়স বিশ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই পিতা ইবনে সউদের প্রতিষ্ঠিত আরব সাম্রাজ্য বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করে; ১৯২৫ সালে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পিতাকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেন। ৬০ বছর বয়সের সময় সিংহাসনচ্যুত ভ্রাতা সউদের স্থলাভিষিক্ত হন। তারপরেই তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ফয়সল আরব বিশ্বকে অভূতপূর্ব উন্নয়নের পথে উন্নীত করেন। আধুনিক সৌদি আরবে আধুনিকতার যে দৃপ্ত পদধ্বনি শুনতে পাই তা ফয়সলেরই কৃতিত্বের রূপায়ন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে উপহার দেন একটি পার্লামেণ্ট, একে তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন 'সুখী রাজার ক্র্যাচ' বলে। ফয়সল প্রকাশ্য ধূমপান ও মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তাছাড়া ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী ব্যাভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, চুরির জন্য হাত কেটে ফেলা ইত্যাদি প্রথা এখনো সচল রেখেছেন, তাঁর সুদূর প্রসারী ইচ্ছে ছিল সৌদি আরবকে একটি শিল্প প্রধান দেশে পরিণত করা। তেল সম্পদ নিঃশেষে নিঃশেষ হয়ে যাবার পরও যেন সাম্রাজ্য দুরাবস্থার সম্মুখীন না হয়, এজন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকেই তিনি দাস প্রথার বিলোপ সাধন

করেন ও অন্যদিকে চালু করেন ব্যাপক শিক্ষা। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনাকে এড়িয়ে তিনি টি.ভি. সেট চালু করেন। সৌদি আরবে এখন টি.ভির সংখ্যা ৩ লক্ষ। মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। বর্তমানে সৌদি আরবে কেবল ছাত্রী সংখ্যাই হচ্ছে ২ লক্ষ। ফয়সলের নির্দেশে আরব থেকে রাজপুত্রদের অক্সফোর্ড ও হার্ভাডে পাঠানো হতো অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর শিক্ষা গ্রহণ করতে। যাতে করে তারা নিজেদের জন্য নিজেরাই উপার্জন করতে পারেন; দেশের প্রয়োজনে নিজেদের কর্ম প্রয়াসে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেন।

দেশে ও বিদেশে যে কারণে ফয়সলের সুখ্যাতি বেড়েছে ব্যাপক ভাবে, তা হলো তেলের ব্যাপারে পশ্চিম বিশ্বের সাথে তার শক্তির ব্যবহার। এ' কারণেই ফয়সলের কণ্ঠ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এতো মূল্যবান। ১৯৭৩-এর আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ফয়সল আর্থিক দিক দিয়ে আরবদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। সর্বোপরি 'তেল' কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করে সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করে দেন। ইসরাইলের প্রতি মার্কিনী সাহায্যের ন্যায় তিনি মিসরীয় ও সিরীয় সৈন্যদের প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেন। পশ্চিমা দেশ সমূহে 'বয়কট' সিদ্ধান্তের তিনি প্রথম সারির নেতা। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ফয়সল মার্কিনীদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ রূপেই শান্তির পথে পরিচালিত হবার পক্ষপাতী। তাইতো দেখি, ফয়সল মিসরের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সাদতকে শান্তির পথে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের জন্যে বহুল ভাবে উৎসাহিত করেছেন।

বাদশাহ ফয়সলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সৌদি আরব যখন একটি শিল্প সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হতে যাচ্ছিল, যখন সমগ্র বিশ্বে সৌদি আরব একটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সমৃদ্ধির সিঁড়ি একের পর এক অতিক্রম করে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ঘাতকের হাতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে মার্চ এই রাজর্ষির শেষ নিঃশ্বাস পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে মুছে গেল (ইন্নালিল্লাহে... ... ...রাজেঊন)। ভ্রাতুষ্পুত্র মোসায়েদের হস্তে

বাদশাহ্ ফয়সলের সকরুণ মৃত্যু শুধু আরব বা আরব জাহানেরই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম জগতের জন্য এক বিরাট মর্মবিদারক ইতিবৃত্ত; এক বিপুল ও অপূরণীয় ক্ষতি। এক সময় সমগ্র মুসলিম জগতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহনের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁর নামে খোৎবা পাঠেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল; কিন্তু বিনয় বশতঃ তিনি তা গ্রহণ করেননি। অবশ্য এ'পথ তিনি গ্রহণ করেননি ঠিক; কিন্তু তিনিই হয়ে উঠেছিলেন মুসলিম জাহানের সংহতি-সমন্বয় সাধনকারী মহা নায়ক। ফয়সল ছিলেন হজরত ওমরের (রাঃ) পদাংক অনুসরণকারী এমন এক বাদশাহ্, যিনি মহান খলিফা ওমরেরই মতো রাজ্যভার গ্রহণ করতে প্রথম অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। আততায়ীর অস্ত্র ওমরেরই ন্যায় তাঁরও জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত করে দিয়েছে।

ক্ষমতার প্রতি নিরাসক্ত ভোগ বিলাস-বিমুখ বাদশাহ ফয়সল রাজ্যভার গ্রহণের দশ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক দেউলিয়াদশাগ্রস্ত পশ্চাদপদ সৌদি আরবকে বিশ্বের সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। সারা দুনিয়ায় সৌদি আরবের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। আশি সালের মধ্যে এই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ পৌঁছবে দশ হাজার কোটি ডলারের উপর। এই পর্বত প্রমাণ ধনৈশ্বর্যের কপর্দকও তিনি আপন ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে তা নিয়োজিত করেছেন তাঁর দেশ এবং অন্যান্য আরব ও অনুন্নত দেশের কল্যাণার্থে।

ব্যাপকভাবে তিনি ইউরোপ আমেরিকা সফর করেছিলেন। কিন্তু স্বল্পভাষী ফয়সল মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বলতেন না। সনাতন আরবীয় পোষাক ছাড়া অন্য কিছু পরতেন না। অগ্রজ ভ্রাতা সাদত কর্তৃক শতাধিক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিলাসবহুল প্রসাদে বাস না করে ফয়সল বাস করতেন একটি ক্ষুদ্রতর গৃহে। শয়ন করতেন তিনি সাধারণ শয্যায়; দুগ্ধ 'ফেননিভ' শয্যা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। সরল ও সাধারণ জীবন যাপনকারী বাদশাহ্ গৃহের কর্মী,—কর্মচারীদের পাশে বসিয়ে এক টেবিলে আহার করতেন। তিনি রাস্তায় চলাকালে

যে কোন নারী-পুরুষ হাত তুলে তাঁর গাড়ী থামিয়ে তাঁর কাছে আর্জি পেশ করতে পারতেন। মৃত্যুকালে মহামনীষী ফয়সল ঘাতকের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "তাহাকে দয়া প্রদর্শন কর। তাহার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। দেশ তোমাদের আমানতে রহিল। বিবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার! নেতৃত্বের সংহতি যেন অক্ষুন্ন থাকে।" একজন আদর্শবান, নিষ্ঠাবান ও প্রত্যুৎপন্নমতি বাদশাহ্‌র উপযুক্ত বক্তব্যই ফয়সল ব্যক্ত করেছেন তাঁর মরণ বেলার উত্তপ্ত মুহূর্তে।

তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনো রহস্যাবৃত। ঘাতক মুসায়েদ বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র। যুক্তরাষ্ট্রের কল রোডা বিশ্ব বিদ্যালয় হতে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতকডিগ্রী নেন। অনেকের ধারণা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও প্রতিশোধ স্পৃহা হতেই যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শাহজাদা,—বাদশাহ্‌কে হত্যা করেন। ইতিপূর্বে মোসায়েদের এক ভাই বাদশাহের পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তিনি এক বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আবার অনেকের ধারণা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই বাদশাহ কে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। অভিনেত্রী ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে মোসায়েদের অবৈধ প্রেম ছিল। অনেকে অনুমান করেন, ইহুদী কিংবা মার্কিনী ইশারায় ক্রিশ্চিয়ানা মোসায়েদের দ্বারা এই কার্য করিয়েছে। অবশ্য মোসায়েদের পরিণাম ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী সংসাধিত হয়েছে, শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে। অপরাধী তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে ফয়সল প্যালেষ্টাইন নেতা ইয়াসির আরাফাতের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে জেরুজালেম মসজিদে নামাজ পড়তে চান। তিনি বলেন, "জেরুজালেমের মুসলিমদের মুক্তির দায়িত্ব সকল আরবদের কাঁধে সম্মিলিতভাবে অর্পিত। আরব-জাহানের একাত্মতা ব্যতিরেকে এ কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব নয়।" তিনি জানান মধ্যপ্রাচ্যে কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে ফিলিস্তি-নীদের অধিকারকেই আগে বাস্তবায়িত করতে হবে।" বাদশাহ্‌ ঊর্ধে হাত তুলে প্রার্থনা করেন, আল্লাহর সাহায্যে যেন তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। তিনি বলেন, "ইসলাম বিশ্বাসের পূত-পবিত্র পথ ধরেই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আসতে পারবে।"

বাদশাহ্‌ সমাধিস্থ হয়েছেন। ওহাবী বংশের রীতি অনুসারে কোন স্মৃতি ফলক থাকবে না তাঁর সমাধি পাশে। না থাকুক; কিন্তু তিনি চিরদিন বেঁচে রইবেন বিশ্বের সকল মানুষের মনিকোঠায়। একজন শাসকের এত বড় সৌভাগ্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

মোয়াম্মার গাদ্দাফী

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক সোনাঝরা বিকেলে কায়রোর বিমান বন্দরে একটি বিমান অবতরণ করলো। সুদেহী, চটপটে এক ব্যক্তি দ্রুতপদে রানওয়ে অতিক্রম করে অপেক্ষমান এক সুদৃশ্য গাড়ীর পার্শ্বে এসে গাড়ীতে চড়ে বসলেন এবং ড্রাইভারকে বললেন, চালাও। হতভম্ব ড্রাইভার সামান্য ইতস্ততঃ করে গাড়ী চালাতে শুরু করলো। কিছু দূর এসে ভদ্রলোক গাড়ী থামাতে নির্দেশ দিলেন। এক লাফে গাড়ী থেকে নেমে অনুসরণকারী পেছনের গাড়ীর কাছে এসে বললেন, আর যদি অনুসরণ করার চেষ্টা কর, তা হলে স্রেফ গুলি করে মারবো। ততক্ষণে অনুসরণকারী গাড়ীর আরোহী ভদ্রলোককে চিনতে পেরে জিহবায় কামড় দিয়েছে। ভদ্রলোক পূণরায় তাঁর গাড়ীতে ফিরে এলেন। প্রেসিডেণ্ট হাউসে এসে তিনি জানালেন, গোপন ও ঝটিক। সফরে আনোয়ার সাদত মস্কো গেছেন। ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'হুম !'

এই ভদ্রলোকটি আর কেউনন, লিবিয়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেণ্ট মোয়াম্মার গাদ্দাফী, এ'রকম অকস্মাৎ ও বিনা সংবাদে কায়রোতে আসা তাঁর নতুন কিছু নয়। তিনি সংগ্রামী কায়রোর জননায়ক। মুসলিম জাতীয়তাবাদের একজন সমৃদ্ধশীল প্রবক্তা। বর্তমান বিশ্বের ব্যতিক্রম প্রসঙ্গ কর্ণেল গাদ্দাফী। পূর্ণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বিশ্বের বোধ হয় একমাত্র প্রেসিডেণ্ট তিনিই, যিনি পুরনো মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রেখে পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থায় শাসন কার্য পরিচালনা করতে চান। গাদ্দাফী তিউনিসিয়া ও লিবিয়ার সংযুক্তি সাধিত করেছেন। মিসরের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তিনি। কিন্তু মিসরের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সাদাতের

ইচ্ছা তা না হওয়াতে গাদ্দাফী মিসরের সঙ্গে লিবিয়ার সংযুক্তি করতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার দরুণ তিনি রাষ্ট্র প্রধানের পদ থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লিবিয়ার জনসাধারণ তাঁদের প্রিয় নেতাকে ছাড়েন নি; গাদ্দাফী পুনর্বহাল হয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে গাদ্দাফী অত্যন্ত সরল, সাধারণ ও ধর্মভীরু। নামাজ আদায় বা অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রতিপালনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল। এ'জন্যই তাঁকে আমরা মরুভূমিতেও নামাজরত দেখি। গাদ্দাফীর সহধর্মিনীও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত।

কথিত আছে, বিয়াবানের বুকে ছোট্ট একটি হাসপাতাল, বেডে শায়িত একটি যুবা—অসুস্থ। ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করলেন এক মহিলা। নার্স। হাতে তাঁর ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ। থমকে দাঁড়ালেন এক মুহুর্ত। রুগ্ন যুবক নির্মিলিত আঁখি তুলে চাইলেন। নার্সের হাত থেকে সিরিঞ্জ খসে পড়ল। রুগ্ন যুবার পদতলে লুটিয়ে পড়লেন সেই নার্স। হে আমীর আমাকে ক্ষমা করুন। দুশমনদের চক্রান্তে আমি ঔষধের বদলে বিষ এনেছিলাম সিরিঞ্জে ভরে। আপনার প্রাণ হরণ করার জন্যে। আমি অপরাধী। আমাকে শস্তি দিন। রুগ্ন যুবা উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু হেসে পবিত্র কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করে বললেন, রাখে আল্লাহ মারে কে। -আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা করুণ-যারা ক্ষমা করেন। আমি তোমাকে মাফ করেছি। আল্লার কাছে মাফ চাও। তিনি দয়াবান পরম দয়াশীল।

সেই রুগ্ন যুবা আর কেউ নন-লিবিয়ার রাষ্ট্র প্রধান কর্ণেল গাদ্দাফী। আর এই নার্সই হলেন গাদ্দাফীর পরবর্তী জীবন সঙ্গিনী।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাদ্দাফী গেছেন মিসরে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা শত শত মিসরীয় মহিলা গাদ্দাফী এবং তাঁর স্ত্রীকে 'ও' করলেন। শ্লোগান উঠালেন তাঁরা গাদ্দাফী প্রতিক্রিয়াশীল। গাদ্দাফীর চিন্তাধারা মধ্যযুগীয়। তারা দাবী জানালেন আমরা নারী স্বাধীনতা চাই, নারী মুক্তি।

গাদ্দাফী মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। ব্যবস্থা করুণ আপনারা।

নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট 'হলে' মিসরের প্রথম শ্রেণীর সহস্র মহিলা সমবেত হলেন। আলোচনা কালে নানান প্রশ্নে তারা জর্জরিত করতে চাইলেন কর্ণেল গাদ্দাফীকে। অবিচল গাদ্দাফী যুক্তি দিয়ে তর্ক টেনে —পবিত্র কোরআন-হাদিস এবং দর্শণ, বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ও বিশ্ব মনীষীদের উক্তির উদ্ধৃতি তুলে ধরে এক এক করে উত্থাপিত সব প্রশ্নের জওয়াব দিলেন। ছবি এঁকে, ডায়োগ্রাম টেনে-জীবতাত্বিক উদাহরণ এনে-প্রমাণ করলেন কোরআনের তথা ইসলামের শিক্ষার সারবত্তা। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, দিয়েছে যে মর্যাদা, তা যে সঠিক বাস্তব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্মত এবং সর্বাধুনিক, তাও সেদিনের সেই শতাধিক মিনিট বক্তৃতা আলোচনায় তিনি প্রমাণ করলেন। সে আলোচনা বৈঠকের প্রথম সারিতে বসেছিলেন মিসরের প্রথম মহিলা বেগম আনোয়ার সাদত। পাশে বসে স্বামীর ওই সারগর্ভ আলোচনা শুনছিলেন বেগম গাদ্দাফী স্বয়ং।

অতি সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে লিবিয়ার একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব অত্যাসন্ন। আর সে বিপ্লবের নায়ক হচ্ছেন আর কেউ নন-গাদ্দাফী স্বয়ং। মিসরীয় সরকারী পত্রিকা আল-আহরাম জানিয়েছেন, গাদ্দাফী প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা আল্ ফাতাহ্ লিবিয়ার গণকমিটির ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন কর্ণেল গাদ্দাফী। পত্রিকা আলফাতাহ এই প্রথম বারের মত গণকমিটির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। গণকমিটির এক ভাষণে কর্ণেল গাদ্দাফী বলেছিলেন, যাবতীয় ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ-তা প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চাত্যেরই হোক, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ঘটাতে হবে এক নতুন বিপ্লব। কর্ণেল গাদ্দাফী উক্ত বক্তৃতায় দৃঢ়তার সাথে একথাও বলেছিলেন যে, ভাববাদী কমুনিজম এবং বস্তুবাদী পুঁজিবাদের মোকাবেলায় পবিত্র কোরআন ভিত্তিক একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং

প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি তৃতীয় আন্তর্জাতিক মতবাদ। সেই কাঠামো আর মতবাদ থেকেই জন্ম নেবে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধুনিক বিপ্লব সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বাদ।

মধ্যপ্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে গাদ্দাফীর সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। তিনি ইসরাইল সম্পর্কে সব সময় চরম পন্থী। গাদ্দাফী যুদ্ধ বন্ধে বিশ্বাসী নন; যতদিন পর্যন্ত হারানো আরব ভূমি পুনরুদ্ধার না হয় ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতি তিনি।

১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে লিবিয়া সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও মিসর যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়াতে গাদ্দাফী ভীষন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর রাগ হবার বিবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে মিসর, লিবিয়া সংযুক্তি করণে বাধাদান এবং যুদ্ধের ষ্ট্রাটিজি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় অন্যতম। প্রকাশ্যেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্ত ষ্ট্রাটিজি ভুল। এর ফলে বিরাট রকম স... আশা করা ভুল হবে।" যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়ায়, তিনি সাদতের প্রকাশ্য সমালোচনায় মুখরিত হন।

নিউজউইক পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তাঁকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ—আপনি বলে থাকেন, পরিণতি যাই হোক, আরব রাষ্ট্রবর্গের উচিৎ ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এ'ধরণের কার্যকলাপের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

গাদ্দাফী ঃ—যুদ্ধতো অনেক রকমের হতে পারে। আসলে এটা এমন এক যুদ্ধ, যা বিভিন্ন ফ্রণ্টে পরিচালিত হবে এবং প্যালেষ্টাইনীদের নিজস্ব আবাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত সে যুদ্ধ চলবেই। এই যুদ্ধে তেলকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে তা সামরিক যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর হবে।

প্রশ্ন ঃ—ইসরাইলের সাথে ফায়সালা করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

গাদ্দাফী ঃ—একবার যদি ইসরাইলকে নিঃসঙ্গ করা যায়, তাহলে সমস্যার সমাধান আপসেই হয়ে যাবে। এখনকার কার্যক্রম সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গৃহীত হচ্ছে। প্রতিদিনই ইসরাইল আরো বেশী করে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। এবং ইসরাইল যেদিন বুঝতে পারবে যে, সে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ এমনকি আমেরিকাও আর তার মদদকারী নয়, তখন সমাধান নিজেই তার বৈপ্লবিক পন্থা খুঁজে নেবে।

প্রশ্ন ঃ—আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিশেষ কি পরিবর্তন আপনি চান?

গাদ্দাফী ঃ—আমেরিকা যদি ইসরাইলকে বলে দেয় যে, আরব ভূমি দখল রাখার কোন অধিকার নেই, তবে সেটাই হবে আরব-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বাস্তব লাভ।

প্রশ্ন ঃ—এর দ্বারা কি আপনি ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে দেয়ার কথা বলছেন?

গাদ্দাফী ঃ—অধিকৃত আরব এলাকার ব্যাপারে আমার মাথা ব্যথা নয়। আমি বলছি প্যালেষ্টাইন রাজ্য সম্পর্কে—।

প্রশ্ন ঃ—আপনি তো মার্কসবাদ, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। আপনার রাজনৈতিক দর্শন তাহলে কি?

গাদ্দাফী ঃ—সমাজবাদ আমার দর্শন এবং আমি আমার লোকদের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করতে চাই। কমিউনিজম ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করে। এটা আমাদের আদর্শের বিরোধী। আর পুঁজিবাদতো এখানে পুরোপুরিভাবেই মৃত।

আদর্শবাদের এই দৃঢ় অভিব্যক্তিই প্রেসিডেণ্ট গাদ্দাফী।

লায়লার হাইজ্যাক যুদ্ধ

১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে প্যালেষ্টাইনী মুক্তি যোদ্ধা লায়লা খালেদের দুঃসাহসিক বিমান হাইজ্যাককে কেন্দ্র করে সমগ্র আরব বিশ্ব দুলে উঠেছিল যুদ্ধে, সংঘাতে, আতঙ্কে; প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যু পর্যন্ত প্রলম্বিত ২৫ দিনের নাটকীয় ঘটনাবলী—যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড. বৃটেন আর ইসরাইলী শাসকবর্গের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে সীমাহীন আতঙ্ক উৎকণ্ঠা আর অসহনীয় উদ্বেগের মধ্যে, তারই ইতিবৃত্ত। যুদ্ধ সংঘাত. সন্ত্রাস, সাসপেন্স, থ্রিলিং আর উত্তেজনায় পূর্ণ "লায়লার হাইজ্যাক যুদ্ধ।"

লায়লা খালেদ ঘড়ি দেখে নিলো। বিমানখানি তখন ২০ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ইংলিশ উপকূল পার হচ্ছিলো। ইসরাইলী বিমান সংস্থা এল-আলের এই বোয়িং ৭০৭ বিমানটি ছিনতাই করার ভার দেয়া হয়েছে তার এবং তার এক সহযোদ্ধার উপর।

এটাই তার প্রথম বিমান ছিনতাই নয়। ১১ মাস আগেও সে অত্যন্ত সফলভাবে বিমান ছিনতাই করেছে। কিন্তু আজকের বৈশিষ্ট্য হলো একমাত্র সহযোদ্ধার সংগে তার পরিচয় হয়েছে মাত্র গত কাল। সানফ্রান্সিসকোয় জন্মগ্রহণকারী এই সহযোদ্ধাকে গুপ্ত কাজের সংগে জড়িত থাকার অভিযোগে এফ, বি, আহ, (আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা)-র চরেরা বহুদিন থেকে খুঁজছে, তার নাম আগুর্লো।

আগুর্লোর কাছে আছে একটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড এবং একটি রিভলবার! আর লায়লা খালেদের সঙ্গে আছে মাত্র দু'টি গ্রেনেড। প্রতিটি অস্ত্রই লোহবর্জিত ধাতুর তৈরী—যাতে অত্যাধুনিক' অস্ত্র অনুসন্ধানকারী যন্ত্রকেও ফাঁকি দেয়া যায়।

লায়লার পাশের সিটের মিসেস শেক্‌-এর ভাষায় "১টা ৪৫ মিনিটে তারা হঠাৎ পাইলটের কেবিনের দিকে ছুট দিলো।"

ক্রুদের লাউঞ্জের কাছে পৌঁছতেই ষ্টুয়ার্ড ভিডার আর্গুলোকে আক্রমণ করে বসলো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সংগে আর্গুলো তাকে মাথার পেছনে আঘাত করে ফেলে দিলো। এরপর আর্গুলো রিভলবার দিয়ে ককপিটের দরজায় প্রচণ্ড গুঁতো মারতে লাগলো এবং বিমান বালাকে আদেশ দিলো কড়া নাড়তে। আর লায়লা তখন গ্রেনেড হাতে প্রত্যেকের উপর কড়া নজর রাখছিলো।

পরদিন ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লায়লা পুলিশকে বলেছিলোঃ "পাইলটের দরজার কড়া নাড়ার সময় কে যেন ছিদ্র পথে আমার দিকে উঁকি মারছিলো। এমন সময় আর্গুলো ভয় দেখাবার জন্য গুলি করলো। পরক্ষণেই ভিডার দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালো।" সংগে সংগে আর্গুলোর রিভলভার প্রচণ্ড শব্দ করে গর্জন করে উঠলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ১৪ রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হলো। এর ৭টি আর্গুলোর রিভলভারের—যার ৫টিই বিদ্ধ হলো ভিডারের শরীরের বিভিন্ন অংশে। বাকী ৭টি গুলী করেছে বোয়িং-৭০৭ বিমানখানির নিরাপত্তা প্রহরী—যার ৩টি গুলী আর্গুলোকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

সংঘর্ষের মধ্যেই বিমানটি হঠাৎ করে ড্রাইভ দেয়, আর এর ফলে লায়লা ভারসাম্য হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। গুলী বৃষ্টির মধ্যেও কয়েক ডজন লোক লায়লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, ঘুষি, লাথি ছুড়তে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানটি পরিণত হলো এক ক্ষুদে যুদ্ধক্ষেত্রে। যাত্রীদের বিছানা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়ে রক্তাক্ত মেঝেকে করে তুলেছে ধংসস্তুপ আর ভীত সন্ত্রস্ত নরনারীর আর্তচীৎকার বিমানটিকে নরকতুল্য করে তুলেছে।

৪ মিনিটের এই সংঘর্ষ শেষ হওয়ার মাত্র ১৪ মিনিটের মধ্যে বিমানটি লণ্ডনের হীথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। তীব্র উত্তেজনা আর কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে লায়লা, আর্গুলো এবং ভিডারকে

হাসপাতালে নেয়া হলো। লায়লা তখন হিষ্টিরিয়া রোগীর মত কাতরাচ্ছে। দু'হাত পিছন দিকে বাঁধা অবস্থায়ই মৃত্যুপথযাত্রী আগু'লোকে অক্সিজেন দেয়া হলো। হাসপাতালে আনার ৩ মিনিট আগেই তার নাড়ি বন্ধ। পৌঁছার পর পরই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলো।

যন্ত্রনাকাতর মুখে লায়লা চীৎকার করছিলো: "পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ প্যালেষ্টাইন।" একজন মহিলা পুলিশ লেখার জন্য তাকে একটুকরা কাগজ দিলো। তাতে সে তার বয়স লিখলো এবং জানালো যে সে হাইফা থেকে এসেছে। তার কাছে ৩ টুকরা কাগজ পাওয়া গেলো। এর একটিতে যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে লেখা ছিলো: "ভদ্রমহোদয়গণ। অনুগ্রহ করে আপনাদের সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন। নতুন ক্যাপ্টেন সাদিয়া বিমান পরিচালনা করছে। প্রত্যেকেই হাত মাথার পেছনে রাখুন। আপনারা চিন্তিত হবেন না, অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা বন্ধু দেশে উপস্থিত হবেন।"

লায়লা পরে পুলিশকে বলেছিলো: "কোন আরোহীকে হত্যা করা এমনকি আহত করার ইচ্ছাও আমাদের ছিল না।" হাসপাতালে আগু'লোর মৃত্যু সংবাদ শুনে সে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো।

লায়লা খালেদকে এর পরের চব্বিশটি রাত থানায় আটকে রাখা হয়। আটক অবস্থায় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, কম্যাণ্ডো বন্ধুরা তাকে মুক্ত করবেই।

জর্দানের গা'খান্নায় সূর্য তখন মাথার উপরে। গেরিলাদের একটি ক্ষুদ্র দল এখানকার ডাউসনস বিমানবন্দরের রানওয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলো। লায়লা খালেদের অভিযান ব্যর্থ হলেও তাদের অন্য ৩টি অভিযান আশাতীত সফলতা বয়ে এনেছে। ঐদিনই দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে ওদের ছিনতাই করা ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন্স এর বোয়িং-৭০৭ খানি ১৪৫ জন যাত্রীসহ এসে নামলো ডাউসনস বিমান বন্দরে। দ্বিতীয়টি হলো সুইস এয়ারের একটি ডি-সি-৮। ১৪৩

জন যাত্রী এবং ১২জন ক্রু সহ ১টা ১৪ মিনিটে বিমানটি এখানে অবতরণ করে। তৃতীয় বিমানটি হলো প্যান আমেরিকান বিমান সংস্থার একটি জাম্বো বিমান।

জাম্বোর ছিনতাইকারী দু'জন দেখতে ছিলো নিগ্রোদের মত। পশ্চিমা জগতের কেউ কি কল্পনাও করতে পেরেছিলো যে, প্যালেষ্টাইনীদের মধ্যে দেখতে কেউ নিগ্রোদের মত হতে পারে?

ছিনতাই করা জাম্বোখানি বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়ার জন্য কায়রো বিমান বন্দরে আনা হয়। প্রেসিডেণ্ট নাসের যাতে বিমানটি আমেরিকাকে ফেরত দিতে না পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

যাত্রীদের নামিয়ে দেয়ার পর পরই বিমানটিকে উড়িয়ে দেয়া হলো। আর সংগে সংগে এক কোটি পাউণ্ড মূল্যের জ্বলন্ত বিমানখানি কায়রোর রাতের আকাশে তীব্র আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করলো। আর এর মাত্র ১৮ মিনিট পরই ইসরাইল যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে মিসরের সংগে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানালো।

ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ-এর জেট এবং সুইস এয়ার এর ডি-সি-৮ বিমান দু'টি জর্দানের গা'খান্নার ডাউসনস বিমানবন্দরে পৌঁছার পরপরই গেরিলারা আমেরিকাকে তাদের দাবী জানিয়ে চরমপত্র পাঠালো:

(১) বৃটিশ যাত্রীদের জীবনের বিনিময়ে লায়লা খালেদের মুক্তি, (২) জার্মান যাত্রীদের জীবনের বিনিময়ে জার্মানীতে আটক ৩জন গেরিলার মুক্তি, (৩) সুইস যাত্রীদের জীবনের বিনিময়ে সুইজারল্যাণ্ডে আটক ৩ জন গেরিলার মুক্তি এবং (৪) ইসরাইলী ও মার্কিন যাত্রীদের জীবনের বিনিময়ে ইসরাইলে আটক অজানা সংখ্যক গেরিলার মুক্তি। মজার ব্যাপার এই যে, দু'টি বিমানে ৩১০ জন জিম্মীর মধ্যে বৃটিশ নাগরিক ১ জনও ছিল না। কিন্তু একথা জানা না থাকায় বৃটিশ সরকার লায়লা খালেদকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে সম্মতিসূচক জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলো। এভাবেই ধূর্ত বৃটিশ সরকার বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ব্ল্যাক মেইলের শিকারে পরিণত হলো।

আর এই ঘটনার পরিণতির ব্যাপকতা যে কোন আন্তর্জাতিক ঘটনাকে হার মানিয়ে দিতে পারে। এর ফলে জর্দানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ এবং জন্ম নেয় এক আন্তর্জাতিক সংকট। জর্দানের বাদশাহ হোসেন অল্পের জন্য উৎখাত হওয়া থেকে বেঁচে যান, পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা নাসেরের মৃত্যু হয় ত্বরান্বিত আর বিশ্বের পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের বেলাভূমিতে সশস্ত্র সংঘর্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

ওয়াশিংটন, লণ্ডন, বন আর বার্ণের রাজনৈতিক নেতারা এখন মাথার চুল ছিড়ছেন, রাতে তাদের ঘুম হয়নি—গেরিলাদের দাবীর ব্যাপারে কি করা যায় এই চিন্তায়। সকল প্রকার রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক পদ্ধতিতে রেডিও, টেলিফোনের মাধ্যমে কয়দিন ধরে চলতে লাগলো চরম উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা। এ যেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাজধানীতে বসে বসে দাবার ঘুঁটি চালা। এক পক্ষে আছে পপুলার ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইন (পি, এফ, এল, পি,) আর অন্যপক্ষে আমেরিকা, বৃটেন, সুইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং ইসরাইল।

গা'খান্নার ডাউসন্স বিমানবন্দরে জর্দানী সেনাবাহিনী ছিনতাই করা বিমান এবং ইসরাইল সীমান্তের দিকে রাইফেল তাক করে অবস্থান নিয়েছিলো—কারণ গত রাতে ৩টি ইসরাইলী হেলিকপ্টার এসেছিলো গোয়েন্দাগিরি করার জন্য।

সকাল সাড়ে দশটায় জর্দান সরকারের পক্ষে আলোচনার জন্য গেরিলাদের আস্থাভাজন জেনারেল মাশুর হডিথা এসে উপস্থিত হলেন। দুপুরের দিকে ঠিক হলো যে, সরকারী সৈন্যরা ২ কিলোমিটার সরে যাবে এবং গেরিলারা ১২৭ জন শিশু এবং মহিলাকে মুক্তি দেবে।

ঐদিনই ওয়াশিংটনে আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইসরাইলের মধ্যে অনুষ্ঠিত জরুরী আলোচনায় স্বীকার করা হলো যে, গেরিলাদেরকে সহজে নোয়ানো যাবে না। ইসরাইলের বিরোধিতা সত্বেও অন্য দেশগুলো ৭ জন গেরিলার বিনিময়ে সকল জিম্মির মুক্তিদানের

অনুরোধ জানালো।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নিজেদের মধ্যেকার আলোচনা সমন্বিত করার ক্ষেত্র ওয়াশিংটন থেকে বার্ণে পরিবর্তন করলো। লণ্ডনে ১নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বৃটিশ পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব আম্মানে অবস্থানকারী রেডক্রস প্রতিনিধি মিঃ এ রোচট-এর উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

এদিকে গা'খান্নার ডাউসন্স বিমান বন্দরে গেরিলারা জিম্মীদের সংগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করলো। জিম্মীরা সাংবাদিকদের জানালো যে, তাদের সংগে গেরিলারা খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ-এর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আল কিবুরস বললো যে, তাদেরকে প্রচুর পানি এবং ভাল খাবার দেয়া হয়েছে। তার ভাষায় গেরিলাদের দেয়া রুটি ছিল 'চমৎকার।' সাংবাদিকরা নিউইয়র্কবাসী একজন আমেরিকান—জোনাথান ডেভিডকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, আমেরিকান ইহুদী এমনকি যাদের সংগে ইসরাইলী পাসপোর্ট রয়েছে তাদের সংগেও গেরিলারা অন্য দশজন যাত্রীর মতই ব্যবহার করেছে। তাদেরকে প্রয়োজন মত পানি এবং খাদ্য দেয়া হয়েছে। বিশালাকৃতির জোনাথানকে তার দীর্ঘ দাঁড়ির জন্য মনে হচ্ছিল যেন মরুভূমির বুকে এক ঈশ্বরপ্রেরিত দূত।

বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গেরিলা এবং জর্দানী বাহিনীর মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো তা একদিনের বিরতির পর গত গভীর রাতে আবার শুরু হয়েছে। ভোরের দিকে আম্মানের প্রধান প্রধান রাস্তায় তীব্র সংঘর্ষ পূর্ণ যুদ্ধের রূপ নিলো।

জিম্মীদের মধ্যে বৃটিশ নাগরিক একজনও নেই। বৃটিশ সরকার একথা জেনে ফেলবার আগেই পি, এফ, এল, পি, এক চমৎকার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা আঁটলো।

বাহরায়েন বিমানবন্দরে অপেক্ষমান বৃটিশ এয়ারওয়েজ-এর ডিসি-১০ বিমানের পাইলট ক্যাপ্টেন সিরিল গুলবর্ণের বিশ্বাস ছিলো যে, ছিনতাইকারী

সফল হওয়ার পর প্রতিটি যাত্রীই বন্ধু বনে যায়। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই চরম ঔদ্ধত্যের সংগে তার দিকে উদ্যত প্যালেষ্টাইনী কম্যাণ্ডোর পিস্তল তাকে এই ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য করলো।

ডিসি-১০ বিমানের যাত্রীদের মধ্যে প্যালেষ্টাইনী ছিনতাইকারী কেউ আছে কিনা দেখার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীরা সময় নষ্ট করায় বিমানের জনৈক বৃটিশ যাত্রী মেজর নরম্যান পটস বিরক্তবোধ করছিলেন। স্ত্রী জেনিফারকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি বললেনঃ "আজকের এই সকালে কেউ ছিনতাই করার চেষ্টা করলে আমি একাই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবো।"

যাত্রীরা যার যার আসনে বসার পরপরই বিমান যাত্রা শুরু করলো। কয়েক মিনিট পরই একজন লম্বা পাতলা লোক পিস্তল হাতে চীৎকার করে উঠলোঃ "পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন প্যালেষ্টাইন।" মেজর পটস ভাবলেন, লোকটি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার মেয়েদের পাশে বসে থাকা দ্বিতীয় ছিনতাইকারী পিস্তল হাতে নিয়ে এক লাফে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। ছিনতাইকারীরা জানালো যে, তাদের সংগে আরো দু'জন গেরিলা আছে। তারা যাত্রীদের সতর্ক করে দিলো যে, কেউ তাদের অবাধ্য হলে তাকে হত্যা করা হবে। এতক্ষণে মেজর পটস বুঝতে পারলেন যে, ৩৫ হাজার ফুট উপরে গেরিলাদের আকাশ যুদ্ধ করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পটস-এর মতে গেরিলারা মাতাল না হলে কিছুতেই এই দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে পারতো না।

পিস্তলধারী ছিনতাইকারীর সতর্ক নির্দেশে বিমানটি বৈরুতের দিকে উড়ে চললো। বৈরুতে জ্বালানী ভরার পর ১১৫ জন আরোহীসহ বিমানটি জর্দানের ডাউসনস বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করলো। এই ১১৫ জনের ৫২ জনই ছিল বৃটিশ। বৈরুত থেকে মোনা সাউদী নামের একজন মহিলাসহ আরো ৩জন গেরিলা আরোহণ করলো।

এদিকে ডাউসনসে জনৈক মার্কিন তরুণী একটি সন্তান প্রসব করায় জিম্মীর সংখ্যা একজন বেড়ে গেল। আর গেরিলারা স্বর্ণকেশী বৃটিশ তরুণী লেসলীকে আরব তরুণের বান্ধবী বলে ছেড়ে দেওয়ায় এবজন জিম্মী কমলো। আসলে সে ছিল জনৈক ইরানী তরুণের প্রেমিকা।

উত্তর জর্দানের গেরিলারা জর্দানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ইরবিদকে রাজধানী করে প্রথম আরব সোভিয়েত রাষ্ট্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করলো। এর ফলে জর্দান সংকট চুড়ান্ত সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছলো।

গৃহযুদ্ধের আগে পপুলার ফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ছিল ২ হাজার। এর নেতা জর্জ হাবাস মনে করতেনঃ "বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ১০০ জন গেরিলা যোদ্ধা ১ হাজার ভারাটে সৈন্যকে সহজেই হারিয়ে দিতে পারে। ইসরাইলের সংগে নিয়মিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের পক্ষে হবে চরম বোকামী। আমাদের উচিত এখানে সেখানে যেখানে যেভাবে পারি শত্রুকে ঘায়েল করা এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া।"

গেরিলারা ডিসি—২০ বিমানের জিম্মীদের জানিয়ে দিলোঃ "তোমাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু প্রয়োজন হলে তোমাদেরকে হত্যাই করা হবে বলে আমরা শঙ্কিত।"

এদিকে বৈরুতে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল যে, আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবহর লেবানন উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে। এছাড়া তুরস্কের আদানায় অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি থেকে ২৫টি ফ্যাণ্টমের প্রহরাধীনে ৪টি সি—১৩০ পরিবহন বিমান আসছে। গুজব পড়ে গেল যে, আমেরিকা বৃটিশ সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইসরাইলের পক্ষে যুদ্ধে নামছে।

পশ্চিমা দেশগুলো এখনো লায়লা খালেদ এবং অন্য ৬ জন আটক গেরিলাকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে। কম্যাণ্ডোদের আশা হলো ইসরাইলের একগুয়েমির জন্য বন্ধু দেশগুলো তাকে ত্যাগ করবে যার ফলে সে একঘেয়ে হয়ে পড়বে। তাদের এ আশা যথেষ্ট পরিমাণে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিলো।

হঠাৎ করে ডাউসনসের জিম্মীদের জানানো হলো যে, মহিলা এবং

শিশুদের আম্মানে নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আম্মান পোঁছে তারা সাংবাদিকদের সংগে ডাউসনসের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প জুড়ে দিলো। গেরিলাদের সংগে বন্ধুত্বের কথা বলতে গিয়ে একজন জানালো যে, কখনো কখনো তারা পিপাসার্ত জিম্মীদেরকে নিজেদের স্বল্প পরিমাণ পানির ভাগ দিতো। এর ফলে তাদের নিজেদের ভীষণ কষ্ট করতে হতো।

এগার বছর বয়সের মাইকেল হ্যাচার তার ছোট্ট টিনের বাক্স থেকে তার পোষা কাছিম বের করে বললো যে, নিজের অংশের খাবার পানি অল্প অল্প করে কাছিমকে খাইয়ে সে মরুভূমিতে এটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আম্মানে খবর এল যে, গেরিলারা বিমানগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন গুলবর্ণ এবং মেজর পটস ছাড়া বাকী সবাইকে ওরা আম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বিধ্বস্ত বিমানগুলো থেকে কালো ধোঁয়া আর কমলা রংয়ের শিখা উঠতে দেখে গেরিলারা তৃপ্তির হাসি হাসছিলো। ৪৫ মাইল দূরে আম্মানের হোটেল ইণ্টারকন্টিনেণ্টাল থেকে জিম্মীরা এই ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলো। এক কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড মূল্যের ৩টি বিমান ধ্বংস করে দিয়ে গেরিলারা প্রমাণ করলো যে, ফাঁকা বুলি আওড়ানো তাদের অভ্যাস নয়।

অবশেষে বাকী জিম্মীদেরকেও আম্মান নিয়ে আসা হলো। বর্তমান জিম্মীর সংখ্যা কত তা জানানোর জন্য পি, এফ, এল, পি'-র হেড কোয়ার্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হলো। হেড কোয়ার্টারের হাল্কা-নীল দেয়াল ছিল বিভিন্ন শ্লোগান, পোষ্টার এবং ছবিতে ঢাকা। গেরিলা নেতা ইব্রাহীম সাংবাদিকদের জানালেন যে, অবশিষ্ট জিম্মীর সংখ্যা ৪০ জন এবং এদের মধ্যে ৫ জন ইসরাইলী তরুণী রয়েছে যারা প্রত্যেকেই ইসরাইলী সেনাবাহিনীতে নাম তালিকাভূক্ত করেছেন। তিনি বললেন, এদের প্রত্যেককে যুদ্ধবন্দীর মর্যদা দেয়া হবে এবং সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হবে। প্যালেষ্টাইনী শরণার্থীদের চেয়ে জিম্মীরা অনেক ভাল অবস্থায় আছে বলে তিনি জানালেন। জিম্মীদেরকে আম্মানে নিয়ে আসার সময় গেরিলারা জর্দানী বাহিনীর উস্কানীর মুখেও ধৈর্যের পরিচয় দেয়। তাদের

উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে আটক কমরেডরদের উদ্ধার করা—রক্তপাত তাদের উদ্দেশ্য নয়। আর এ জন্যই তারা মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ জিম্মীদের মুক্তি দিয়েছেন বলে ইব্রাহীম জানালেন।

২২ জন জিম্মীকে ওয়াদাত-এ ডাঃ জর্জ হাবাশ-এর বাড়ীতে সরিয়ে আনা হলো। হাবাশ সম্ভবতঃ তখন উত্তর কোরিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

এদিকে লণ্ডনে লায়লাকে একনজর দেখার জন্য সাংবাদিকরা সারাদিন থানার এদিক ওদিক ঘোরাফিরা করছিলেন। ফলে কর্তৃপক্ষ দিনের বেলার পরিবর্তে রাতের বেলায় থানার প্রাঙ্গনে তাঁর পায়চারীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইদিন লায়লা খালেদ জানতে পারলেন যে, তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। গেরিলারা যাতে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নেয় তার জন্য আপোষমূলক ব্যবস্থা হিসেবে লায়লাকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদানের জন্য আম্মানস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ ফিলিপস বারবার অনুরোধ জানানোর পর বৃটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে বলে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার সেই সংগে এটাও জানিয়ে দিলেন যে, লায়লাকে মুক্তি দেয়ার আগে প্রতিটি জিম্মীকে মুক্তি দিতে হবে।

বাদশাহ হোসেন চাইছিলেন পি, এফ, এল, পি'-র সংগে পি, এল, ও-র সম্পর্কের অবনতি ঘটুক—যাতে তিনি পি, এল, ও'-র বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে পারেন। তিনি পি, এল, ও, নেতা ইয়াসির আরাফাতকে বললেন যে, 'পি, ডি, এফ, এবং 'পি, এফ, এল, পি'-র বিরুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী অভিযান চালালে পি, এল, ও, যেন চুপ থাকে। ইয়াসির এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে, এধরণের প্রস্তাবে রাজী হলে এর পরে রাজকীয় বাহিনী তাঁর নিজস্ব সংগঠন আল ফাতাহর বিরুদ্ধেও অভিযান চালাবে।

উত্তর জর্দানে রাজকীয় বাহিনী এবং গেরিলাদের মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে আম্মান রেডিও থেকে স্বীকার করা হলো যে, উভয়পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়েছে।

এদিকে ইসরাইলের অভ্যন্তরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ইসরাইল তার অধিকৃত এলাকায় ৮০ জন মহিলাসহ মোট ৪৫০ জন আরবকে গ্রেফতার করলো। ইসরাইলী জিম্মীদের মুক্ত করার ব্যাপারে দর কষাকষিতে সুবিধা পাওয়ার জন্যই ইসরাইল এই পাইকারী গ্রেফতার চালিয়ে যেতে লাগলো।

ইসরাইল ছাড়া অন্য দেশগুলো যখন জিম্মীদের মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় আরবদেরকে পাইকারীভাবে গ্রেফতার করায় ইসরাইলের মিত্ররা তার উপর অত্যন্ত বিরূপ হলো। তারা ইসরাইলকে জটিল সমস্যাকে জটিলতর করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলো।

গেরিলাদের সংগে বাদশাহ হোসেনের মতবিরোধের ফলে জর্দানী বাহিনীতে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিল। সেনাবাহিনীর উগ্র অংশের সংগে তার সম্পর্ক দিন দিনই উত্তেজনাকর রূপ নিতে থাকলো। এই উগ্র অংশ গেরিলাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বাদশাহর উপর চাপ দিচ্ছিল। এমনকি একজন পদস্থ সামরিক অফিসার রাজপ্রাসাদে বাদশাহর মুখের উপর বলে দেন যে, তারা গেরিলাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত। এদিকে উত্তর জর্দানে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ বিরতির পর পরিস্থিতি অধিকতর মারাত্মক রূপ নেয়। এই এলাকায় গেরিলারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এই উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেও জিম্মীদের প্রতি গেরিলাদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মানবিক। এই দিন অর্ণেষ্ট হার্টিল তার ডায়রীতে লেখেন: "প্রতিটি জিম্মী এমনকি সাত জন ইহুদী জিম্মীর সঙ্গেও ওরা অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করছিলো।"

ক্যাপ্টেন গুলবর্ণের পরামর্শে ৮ জন বৃটিশ জিম্মী লণ্ডনের পত্রিকায় ছাপানোর জন্য এক খোলা চিঠিতে লিখলেন: "বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির বিবেচনায় গেরিলারা আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করছে। কিন্তু আম্মানের পরিস্থিতি দিন দিনই জটিল হচ্ছে। আমাদের সবারই মনোবল অক্ষুন্ন আছে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে

মুক্ত করার ব্যবস্থা করুন। প্রতিটি নতুন দিন অধিকতর সংকটময় রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে।" চিঠিটি লণ্ডনে পাঠানোর জন্য একজন গেরিলার হাতে দেয়া হলো। পরদিন লণ্ডনের পত্রিকাগুলো ফলাও করে চিঠিটি প্রকাশ করলো।

এদিকে জর্দানী সেনাবাহিনীর যুদ্ধবাজ সামরিক অফিসাররা সাবেক প্রধান মন্ত্রী ওয়াস ফি তালকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে বাদশাহকে-বোঝালো যে, গেরিলাদের সঙ্গে সেনা বাহিনীর সমঝোতায় আসা মোটেই উচিত হবে না। তারা বোঝালো যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবদুল মোনেম রিফাইকে সরিয়ে দেয়া দরকার এবং কেবলমাত্র সেনা-বাহিনীর হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাদশাহ তাদের পরামর্শক্রমে ঠিক করলেন যে, ফিল্ড-মার্শাল মাজালিকে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং ব্রিগেডিয়ার দাউদকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেবেন।

ভোর ৬টায় আম্মান রেডিও ঘোষনা করলো যে, ১২ জন সামরিক অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে—গেরিলাদের আস্থাভাজন জেনারেল মাশুর হাডিথাকে অপসারণ করা হয়েছে এবং গেরিলাদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করা হয়েছে!

ইয়াসির আরাফাত জেবেল হুসেইন-এ তাঁর হেডকোয়ার্টারে কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী অধিবেশনে ব্রিগেডিয়ার ইয়াহিয়াকে তাঁর মুক্তি-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। পপুলার ফ্রন্টকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হলো—যার ফলে কম্যাণ্ডো আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করার বাদশাহী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বাগদাদ এবং দামেস্কে অবস্থিত গেরিলা-বেতার ঘোষণা করলো, ইয়াসের আরাফাত আম্মানে আরব রাষ্ট্রদূতদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, "নয়া ফ্যাসিষ্ট সরকার উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত প্যালেষ্টাইনীরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।"

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট

নিক্সন তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে মধ্য রাত্রিতে এক জরুরী আলোচনায় মিলিত হলেন।

একই দিনে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মিসেস গোল্ডা মায়ার ওয়াশিংটনে এসেছেন নিক্সনকে আরো ফ্যান্টম বিমান সরবরাহের অনুরোধ জানানোর জন্য। তার আর একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল লায়লা খালেদ এবং অন্যান্য গেরিলাদের মুক্তি দেয়া থেকে বন্ধুদেশগুলোকে বিরত রাখা। কূটনৈতিক মহলে একথা পরিস্কার হয়ে উঠেছিল যে, ছিনতাই সংকট এখন আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের রূপ নিতে চলেছে এবং আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক হস্তক্ষেপের কথা চিন্তা করছে!

এদিকে লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের কূটনীতিক এবং গোয়েন্দারা বুঝে উঠতে পারছেন না সিরিয়া এবং ইরাক জর্দান সংকটে হস্তক্ষেপ করবে কিনা। মাত্র ২ সপ্তাহ আগে ইরাক ঘোষণা করেছে যে, প্রয়োজন হলে জর্দানে অবস্থানরত তার ১২ হাজার সৈন্য গেরিলাদের পক্ষে লড়াই করবে। এছাড়া সিরিয়ারও গেরিলাদের সমর্থনে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

রাতের আঁধারে বাদশাহ্ হোসেনের নব নিযুক্ত কমাণ্ডাররা কমপক্ষে ৫০টি ট্যাঙ্ক এবং কয়েক ডজন সাঁজোয়া গাড়ী মোতায়েন করলো গেরিলাদের হেডকোয়ার্টার এবং প্যালেষ্টাইনী শরণার্থী শিবিরের আশেপাশে। এসব অবস্থান এখন তাদের ট্যাঙ্কের গোলার আওতায়।

সকাল থেকে সরকারী সৈন্যদের সাঁজোয়া এবং গোলন্দাজ বহর সকল সম্ভাব্য গেরিলা অবস্থানের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে। গেরিলা কম্যাণ্ডোদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে শহরের প্রতিটি অলিতে গলিতে তাদের অবস্থান। এবাড়ী ওবাড়ীর আনাচে-কানাচে থেকে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে সরকারী সৈন্যদের উপর তাদের রকেট ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ীগুলোর উপর মারাত্মক আঘাত হানছে।

সরকারী বাহিনীর বিমান বাহিনীতে আছে ২ হাজার সৈন্য, ১৮টি এফ ১০৪-এ ষ্টার ফাইটার এবং ২০টি হাণ্টার বিমান। স্থলবাহিনীতে

আছে ৫৮ হাজার সৈন্য। মোট ৬০ হাজার সৈন্যের মধ্যে প্রচুর প্যালেষ্টাইনী অফিসার রয়েছে যার জন্য মাত্র ২৫ হাজার সৈন্যের উপর বাদশাহ হোসেন পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন।

আর গেরিলাদের সবগুলো সংগঠনের মোট সামরিক এবং আধা-সামরিক যোদ্ধার সংখ্যা হবে প্রায় ৫০ হাজার। তাদের আছে ৫০টি পুরনো মডেলের সোভিয়েত কামান। এছাড়া সিরিয়া এবং ইরাক থেকে তাদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাদের প্রধান অসুবিধা হলো, ট্যাঙ্ক বহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত তেমন কোন অস্ত্র তাদের হাতে নেই। তবে জর্দানের ভেতরে এবং বাইরে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সমর্থন তাদের আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এইদিন বিকেলে প্রেসিডেণ্ট নাসের, প্রেসিডেণ্ট গাদ্দাফী এবং প্রেসিডেণ্ট নিমেরীর বার্তা নিয়ে মিসরীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ সাদেক আম্মান পৌঁছলেন। বার্তায় প্রতিটি নেতাই উভয় পক্ষের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।

সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় বাদশাহ হোসেন তার ব্যক্তিগত রেডিও ষ্টেশনের মাধ্যমে লণ্ডনের গর্ডন ভাইনের সংঙ্গে জর্দানের অবস্থা সম্বন্ধে বলছিলেনঃ "এখন এখানে দুঃসময় চলছে। কিন্তু শীগ্‌গিরই আমরা শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবো!" কিন্তু তাঁর ট্যাঙ্ক পরে আরো ৭ দিন একটানা প্রচেষ্টা চালিয়েও যে শান্তি ফিরিয়ে আনলো তাকে কেবল তথাকথিত শান্তিই বলা যায়।

সরকারী বাহিনী খোদ আম্মান শহরেই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলো না। আর উত্তর জর্দানে তো ধরতে গেলে গেরিলারাই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সিরীয় সীমান্তের ঠিক দক্ষিণের রামথা এবং ইরবিদ শহর দু'টিতে তারা পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সিরিয়ার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী সড়ক দখলে রেখে তারা প্রয়োজনীয় সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল।

শুক্রবার ভোরে বাদশাহ হোসেন রামথা শহর দখল করার জন্য

ব্রিগেডিয়ার ঘাসিদ-এর নেতৃত্বে ৪০ তম ট্যাঙ্ক বহর পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গেরিলাদের সঙ্গে সরকারী বাহিনী পেরে উঠলো না। গেরিলাদের ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী স্বল্প পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার তাদেরকে হতচকিত করে দিলো। রামথায় ব্যর্থ হয়ে ব্রিগেডিয়ার ঘাসিদ ইরবিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। এইদিন সিরীয় সীমান্ত দিয়ে আরো ১ হাজার গরিলা জর্দান প্রবেশ করলো। তাদের সংগে ছিল রুশ নির্মিত কয়েকটি ট্যাঙ্ক এবং কিছু সংখ্যক চীনা কামান। ধীরে ধীরে গেরিলারা সমগ্র উত্তর জর্দানের উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সংকটজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমেরিকা তার সামরিক শক্তির যে বিরাট অংশকে ভূমধ্যসাগর অভিমুখে পাঠিয়ে দিলো তা সিরিয়া, ইরাক এবং এমনকি রাশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য যতেষ্ট। দেড় হাজার নৌসেনাসহ হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ গুয়াম, প্রতিটি ৬০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি অতিকায় আক্রমণকারী জাহাজ এবং সৈন্যবাহী জাহাজ আলপাসো। আক্রমণকারী জাহাজ দু'টিতে ছিল ৮০টি জঙ্গী বিমান। এ ছাড়া, ইটালী থেকে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের অগ্রবর্তী জাহাজ স্প্রিংফিল্ডও মধ্যপ্রাচ্য অভিমুখে যাত্রা করে।

এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তেমন কোন উচ্চবাচ্য না করলেও ভূমধ্যসাগরে আগে থেকেই তার নৌ-শক্তির যে অংশ নিয়োজিত ছিল তার শক্তি মোটেও কম ছিল না। রাশিয়ার ছিল ২টি ক্রুজার, ৬টি ডেষ্ট্রয়ার, ৫টি রক্ষী জাহাজ ১০টি সাবমেরিন এবং ২২টি সাহায্যকারী জাহাজ।

আটক বৃটিশ জিম্মীদের লণ্ডনস্থ পরিবারের লোকজনদের আশ্বস্ত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম এক ছোট্ট চায়ের আসরের আয়োজন করলেন। জিম্মীদের মুক্ত করার জন্য সরকার সব রকম চেষ্টাই করছেন মিঃ হিউম এই আশ্বাস দেয়ার পর পরই ক্যাপ্টেন গুলবর্ণের ছেলে কীথ উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে তাকে বললো: "জিম্মীদের মুক্ত করতে হলে বৃটিশ সরকারের উচিত লায়লা খালেদকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া।"

জর্দানী বাহিনীর বর্বর আক্রমণ থেকে প্যালেষ্টানী উদ্বাস্তু শিবিরগুলো রেহাই পেলোনা। বৈরুত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত প্যালেষ্টাইনী উদ্বাস্তু ২০ বছর বয়সের মেয়ে ফাতেমা মাহমুদ পরে সাংবাদিকদের বলেছিল ঃ

"কম্যাণ্ডোদের সঙ্গে সংঘর্ষে সরকারী সৈন্যরা ফসফরাস বোমা ব্যবহার করছিলো। কমাণ্ডোরা চলে যাওয়ার পরও ওরা উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর উপর বোমা বর্ষণ করছিলো। বোমার আঘাতে আমার ১৪ মাস বয়সের মেয়েটি মারা গেলো। প্রতিটি, ঘরে আগুন জ্বলতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে আমি বাকী সন্তানদের নিয়ে ট্যাঙ্কের সামনে আহত অবস্থায় নত হয়ে প্রাণ বাঁচানোর অনুবোধ জানালাম। এরপরও ২০ মিনিট ধরে ওরা বোমা বর্ষণ করে চললো।"

ধীরে ধীরে সমগ্র আরব জগত বাদশাহ হোসেনের তীব্র সমালোচনা করতে লাগলো। প্রেসিডেন্ট নাসের অধৈর্য হয়ে উঠলেন, লিবীয় নেতা গাদ্দাফী জর্দানকে দেয় বার্ষিক সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। আর সিরিয়া গেরিলাদের সমর্থনে বহু সংখক ট্যাঙ্ক ও সৈন্য পাঠিয়ে দিল।

অন্যান্য আরব দেশের চাপে পড়ে বাদশাহ হোসেন তার সৈন্যবাহিনীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোন পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ না করার অবস্থা অপরিবর্তিত রইলো।

জর্দানী বাহিনী গেরিলাদের দমনের উদ্দেশ্যে আবার রামথায় আক্রমণ চালিয়েছে। সকালের দিকে সিরীয় ট্যাঙ্কগুলো রামথার আশেপাশের সরকারী অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করলো। সিরীয় হস্তক্ষেপের ফলে বাদশাহ হোসেন প্রমাদ গুণলেন। সিরীয়ার ৮৮০টি ট্যাঙ্কের জায়গায় তার আছে মাত্র ৩১০টি—তাও আবার অর্ধেকই আম্মানে সংঘর্ষে লিপ্ত। সিরিয়ার ২১০টি জঙ্গী বিমান মোকাবিলা করার জন্য তার আছে মাত্র ৩৮টি জঙ্গী বিমান। সিরিয়া পূর্ণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করলে জর্দানী বাহিনী কিছুতেই টিকতে পারবে না।

পঞ্চদশ দিনে রামথায় এক স্কোয়াড্রন জর্দানী সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের সঙ্গে

সিরীয় টি—৫৪ ট্যাঙ্ক বহরের সংঘর্ষের শুরুতেই জর্দান ৫ থেকে ৬টি ট্যাঙ্ক হারালো। অধিকাংশ সিরীয় ট্যাঙ্কের পরিচালনায় ছিল প্যালেষ্টাইনী কম্যাণ্ডো।

ওয়াদি সাওলায় জর্দান এবং সিরিয়ার ট্যাঙ্ক বহরের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষে জর্দান ১০টি এবং সিরিয়া ৩০টি ট্যাঙ্ক হারায়। এই সংঘর্ষে জর্দানী ট্যাঙ্ক বহরের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার মাসিদ মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি শীগ্‌গিরই বাদশাহ হোসেনকে জানিয়ে দিলেন যে, জর্দানী বাহিনীর ক্ষমতা সিরীয়দের তুলনায় একেবারেই কম।

যুদ্ধের গতি দেখে বাদশাহ বুঝতে পারলেন যে, তার সিংহাসন টলটলায়মান। তিনি আম্মানে অবস্থিত বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্রদূতদের আম্মানের বাইরে হুম্মার প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। তিনি রাষ্ট্রদূতদের জানিয়ে দিলেন যে, রাজত্ব রক্ষার জন্য তিনি যে কোন ধরণের মারাত্মক ব্যবস্থা নিতে কসুর করবেন না। তিনি যে সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করলেন কোন আরব তা করতে পারেন বলে কোন রাষ্ট্রদূত কখনো কল্পনাও করতে পারেননি। পশ্চিম দেশগুলো সাহায্য না করলে তিনি সিংহাসন রক্ষার জন্য ইসরাইলের সাহায্য চাইবেন বলে উল্লেখ করলেন।

আর আরব সরকারগুলোকে তিনি জানিয়ে দিলেনঃ "সিরিয়া জর্দানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ইসরাইলকে তার লিপ্সা চরিতার্থ করতে সাহায্য করছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সিরীয় প্রেসিডেণ্ট ডঃ নূর উদ্দীন আল আতাসী জবাব দিলেনঃ

"কোন অজুহাতেই বাদশাহ হোসেন জর্দানে অনুষ্ঠিত অমানুষিক হত্যাযজ্ঞের কথা চাপা দিতে পারবেন না। বাদশাহ জর্দানের প্রতিটি আরবকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমেরিকার সাহায্য পেতে থাকবেন। আমেরিকার জানা উচিত যে তার অনুসৃত নীতির জন্য আরবরা বাধ্য হবে মধ্যপ্রাচ্যের সকল মার্কিন সম্পত্তি ধ্বংস করে দিতে।

বাদশাহ হোসেন ইসরাইলের সাহায্য চাওয়ার কথা চিন্তা করছেন একথা সত্যি কিনা লণ্ডনে নিযুক্ত জর্দানী রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করা হলে প্রবল আত্মবিশ্বাস সহকারে তিনি জবাব দিলেনঃ "বাদশাহ কখনো এ ধরনের চিন্তা করতে পারেন না।

ইসরাইলী বাহিনীর এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট পাইপার বিমানগুলো গোয়েন্দা-গিরির কাজে অত্যন্ত সুবিধাজনক। সাধারণ বিমান বিধ্বংসী কামানের আওতার বাইরে থেকে ৮ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় এরা যে ছবি তোলে সেগুলো হয় অত্যন্ত স্পষ্ট। সূর্য উঠার অনেক আগে এধরণেরই কয়েকটি বিমান উত্তর জর্দানের উপর দিয়ে উড়ে গেল।

অতি ভোরে ১টি সোভিয়েত ক্রুজার এবং ২টি ডেষ্ট্রয়ার তুরস্কের দূর উপকূল বরাবর ঘোরাফেরা করতে লাগলো। এই নতুন যুদ্ধ জাহাজ ৩টি ছাড়াও আগে থেকে যে সব রুশ সামরিক জাহাজ এই এলাকায় ছিল সেগুলো ইসরাইলের একশো ১০ মাইল দূর-উপকুল বরাবর আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবহরকে অনুসরণ করছিলো।

তবে গ্রীস এবং তুরস্কে অবস্থিত ন্যাটোর রাডার ষ্টেশনগুলোর প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী রাশিয়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিমান বহর ঐ এলাকায় পাঠায় নি। আমেরিকাও পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত তার অষ্টম ডিভিশনকে শতর্ককরণ ছাড়াও ৬৯ হাজার টন বহর ক্ষমতাসম্পন্ন অতিকায় জাহাজ জন এফ কেনেডীকে পাঠিয়ে দিলো ষষ্ঠ নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য।

এদিকে উত্তর জর্দানে ইরবিদ এবং রামথা ছাড়াও আদেলুন এবং আরো অনেক ছোট শহর গেরিলাদের হাতে চলে গেছে। সরকারী বাহিনী রাজধানী আম্মানেও পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় বাদশাহ হোসেন পুনরায় পশ্চিমা দেশগুলো এবং এমনকি রাশিয়ার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন।

সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট আতাসী কায়রোতে কয়েকজন আরব নেতার সঙ্গে বেসরকারী আলোচনায় মিলিত হলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের আরব শীর্ষ সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব করলে তিনি তাতে যোগ দিতে

অস্বীকার করলেন! অন্যান্য আরব দেশেও বাদশাহ হোসেনের প্রতি বিরূপ মনোভাব দিন দিন বাড়তে লাগলো। কুয়েত ও জর্দানকে দেয়া বার্ষিক সাহায্য বন্ধ করে দিলো।

সোমবার সারাদিন ধরে ইসরাইল বেন শীন এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক সামরিক সমাবেশ করলো। জর্দান এবং সিরিয়ার সীমান্তে প্রচুর সৈন্য ছাড়াও বহু ট্যাঙ্ক এবং সামরিক গাড়ী জড়ো করায় ৬৭ সালের পর আরব ইসরাইল সম্পর্ক সবচেয়ে সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হলো।

আম্মানে পুনরায় যুদ্ধবিরতির আদেশ দেয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হলো না। গেরিলাদের দাবী অনুযায়ী কয়দিনের যুদ্ধে ১৫ থেকে ২০ হাজার লোক হতাহত হয়েছে।

সোমবার শেষ রাতের দিকে জর্দানী বিমান বাহিনী ইরবিদসহ সকল গেরিলা অবস্থানের উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু করলো। আর সীমান্তের ওপারে ইসরাইলের দু'টি সুসজ্জিত সাঁজোয়া বিগ্রেড পূর্ণ সতর্কীকৃত অবস্থায় অবস্থান করছিলো এবং অন্ধকারের মধ্যে ফ্ল্যাশ লাইট নিক্ষেপ করে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলো।

লায়লা খালেদের ছিনতাইয়ের সপ্তদশ দিনে ছিনতাইয়ের পরিণতি জর্দান সংকট চরম পর্যায়ে উপনীত হলো। এই দিনই সরকারী বাহিনী ইরবিদের উপর মরণ আঘাত হানার জন্য এর দক্ষিণ এবং পশ্চিমের পাহাড়িয়া এলাকায় ব্যাপক সামরিক সমাবেশ ঘটালো। একই দিনে ইসরাইলের এবং তার মিত্র আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিলো শতকরা ৯৯ ভাগ।

কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করেও জর্দানী বাহিনী পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্বে আনতে পারলো না। আম্মানের উত্তরে ধরতে গেলে একটি শহরও ছিল না যেখানে গেরিলাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আম্মানের অংশ বিশেষ তখনও গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে। আরব জগতে সৌদী আরব ছাড়া বাদশাহ হোসেনের দ্বিতীয় কোন বন্ধুদেশ রইলো না যার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। লিবিয়া এবং কুয়াইত সাহায্য বন্ধ করে দেয়ায় জর্দানের আর্থিক অবস্থা অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হলো।

কায়রোয় অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে অস্বীকার করলেন জর্দান সংকটের দুই নায়ক বাদশাহ হোসেন এবং গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত। 'ভয়েস অব প্যালেষ্টাইন' বেতার থেকে ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা করলেন ঃ "ষষ্ঠ দিনের মত আম্মান জ্বলছে। আমাদের হাজার হাজার লোক আশ্রয়হীন হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে রয়েছে প্যালেষ্টাইনী ভাইদের মৃত দেহ।"

ফিল্ড মার্শাল মাজালি ঘোষণা করলেন যে, কেউ দু'জন চরম ও বামপন্থী গেরিলা নেতা জর্জ হাবাশ এবং মাওপন্থী পপুলার ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্ট প্রধান নায়েক হাওয়াতমেহকে ধরে দিতে পারলে ৫ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেয়া হবে।

কিন্তু ছিনতাই, গৃহযুদ্ধ আর আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টির নেপথ্যে নায়ক জর্জ কোথায় সে কথা কেউ বলতে পারলো না। উত্তর কোরীয় বার্তা সংস্থার খবর অনুসারে তিনি ২রা সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর কোরিয়ায়।

ইসরাইল আজ সকালে হাদেরা সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে কয়েকশো ট্যাঙ্ক এবং অতিকায় লরি সমাবেশ করে সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা শুরু করে দিলো। হাদেরায় ইতিপূর্বেই সে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছে। এই দিন ইসরাইল বেটশীন এলাকায় ৩০০ ট্যাঙ্কের এক বিরাট সাঁজোয়া বহর গাছ এবং তরুলতার আড়ালে আড়ালে মোতায়েন করলো।

তুরস্কের আদানায় ১৮টি মার্কিন সি-১৩০ পরিবহণ বিমান ২ ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়ে অবতরণ করলো। এই মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত মার্কিন অষ্টম ডিভিশনের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল ডোনাল্ড ভি, প্যাটেন ঘোষণা করেন ঃ "আমরা বিমান যোগে সামরিক সাহায্য পাঠানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি।" জর্দানে দ্রুত সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য ২ ব্যাটেলিয়ন সুসজ্জিত সৈন্যকে আগে থেকেই সদা সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

সবাই আশঙ্কা করছিল যে, আগামী কালের মধ্যেই ইসরাইল

বিমান এবং ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে জর্দান সীমান্তে প্রবেশ করবে। প্রধানমন্ত্রী মিসেস মায়ার ওয়াশিংটন সফরকালে প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের সঙ্গে যৌথ সামরিক অভিযান চালানোর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন বলে পর্যবেক্ষক মহলে মত প্রকাশ করলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সামুদ্রিক সীমায় এখন আমেরিকার সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

হাণ্টার বিমানের ছত্রছায়ায় জর্দানী ট্যাঙ্ক বহর সিরীয় ট্যাঙ্ক বহরের উপর তীব্র আক্রমণ চালালো। সিরীয় পক্ষে বিমান বাহিনীর ছত্রছায়া না থাকায় যুদ্ধে তারা প্রচণ্ড মার খেলো। এদিকে অন্যান্য আরব নেতাদের চাপে পড়ে প্রেসিডেণ্ট আতাসী সিরীয় বাহিনী অপসারনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সংঘর্ষে জর্দানের ১৯টি ট্যাঙ্ক এবং সিরিয়ায় প্রায় ১০০টি ট্যাঙ্ক এবং ১৭০টি সামরিক যান ধ্বংস হয়।

যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা জর্দানীর অনুকূলে আসার পর বাদশাহ অবসানের জন্যে ৪ দফা প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু ইয়াসির আরাফাত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। গত কয়দিনের যুদ্ধের সময় তিনি বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন ঠিকই কিন্তু কখনো যুদ্ধ বিরতির কথা চিন্তা করেন নি।

আম্মানে তখনো যুদ্ধ চলছে। হোটেল ইণ্টারকন্টিনেণ্টালে আটকে পড়া লোকেরা দেখতে পাচ্ছেন যে, তাদের পাশের বাড়ীগুলো জ্বলছে। কামানের গোলা আর বিমানের বোমার আঘাতে জর্দানের প্রধান প্রধান শহরগুলো তখন ধ্বংসস্তপে পরিণত।

এদিকে লায়লা খালেদ এখনো লণ্ডনে আটক। জিম্মীদের মুক্তির ব্যাপারেও কোন সাড়াশব্দ নেই। আসলে গৃহযুদ্ধের জন্য অন্যসব সমস্যার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সুযোগ কোন পক্ষই পাচ্ছে না।

সিরিয়া জর্দান থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়ায় সরকারী সৈন্যরা পূর্ণশক্তি নিয়ে গেরিলা অবস্থানগুলোর উপর হামলা চালালো। তারা রামথার সংগে যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তাগুলো নিজেদের দখলে আনার পর ইরবিদ এবং রামথায় গেরিলা প্রতিরোধ ভাঙতে অগ্রসর হলো। ইতিমধ্যে

জর্দানী বাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিশন আজলুন, জেরাশ এবং সুয়েলির গেরিলা ঘাঁটিগুলোর উপর কামান এবং ট্যাঙ্কবহর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সমগ্র আরব জগত তখন জর্দানের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার খবর শোনার জন্য উন্মুখ। প্রেসিডেন্ট জেনারেল জাফর আল-নিমেরী ৮ সদস্যের শান্তিমিশন নিয়ে আম্মান পৌঁছলেন—উদ্দেশ্য বাদশাহ হোসেন এবং ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা।

এদিকে কায়রোর জার্দানী দূতাবাসে এক চমকপ্রদ খবর এসে পৌঁছলো। কায়রো সফররত জর্দানী সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার দাউদ-পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের উদ্দেশ্য জর্দানের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সক্ষম অসামরিক জাতীয় সরকার গঠনের পথ উন্মুক্ত করা। পরে জানা গেল যে, তিনি লিবিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন।

সন্ধ্যাবেলায় ইসরাইলী টেলিভিশন দর্শকরা পর্দায় লক্ষ্য করলেন: প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল মোশে দায়ান বলছেনঃ "আমি বাদশাহ হোসেনের পক্ষে। আমি তার সফলতা কামনা করি কারণ আমি তার প্রতিপক্ষ জর্জ হাবাশের বিপক্ষে।" গভীর রাতে গেরিলা বেতার থেকে জেনারেল নিমেরীর শান্তিমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছে জানিয়ে ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা করলেনঃ

"জেবেল ওয়েবদাগামী রাস্তাধরে চলে আসুন। গেরিলা যুদ্ধাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন শান্তি মিশনের গাড়ীগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু শান্তি মিশনের উচিত হবে জর্দানী বাহিনীকে আজ রাতের জন্য জেবেল ওয়েবদা এলাকায় যুদ্ধবিরতি পালনে রাজী করানো। জেবেল ওয়েবদায় অবস্থিত মিশরীয় দূতাবাসে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতি ভোরে ইয়াসির আরাফাত এখানে চলে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট নিমেরী শান্তি মিশনসহ এখানে এসে দেখতে পেলেন যে, জর্দানী বাহিনী তখনো দূতাবাসের উপর বোমা বর্ষণ করে চলেছে। তিনি হুমার প্রাসাদে বাদশাহ হোসেনকে টেলিফোন করে জানালার বাইরে রিসিভার ধরে

রেখে তাকে তার বাহিনীর গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিয়ে দিলেন। বাদশাহ বিশেষ সামরিক দল পাঠিয়ে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলে আলোচনা শুরু হলো।

দুপুরের দিকে প্রেসিডেণ্ট নিমেরী জানালেন যে, ইয়াসির আরাফাত যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়েছেন। একই সময়ে ইয়াসির দামেস্কের গেরিলা বেতার থেকে ঘোষণা করলেন :

"আমাদের মহান জনগণ, দুঃসাহসী বিপ্লবী বন্ধুগণ! অগণিত নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য, আহতদের সেবার জন্য, আমি প্যালেষ্টাইনী বিপ্লবী ভাইদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আরব নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধবিরতি পালনে রাজী হয়েছি। আমি আমার বিপ্লবী বন্ধুদের প্রতি এই শর্তে যুদ্ধবিরতি পালনের আহ্বান জানাই যে, অন্যপক্ষও তা পালন করবে।"

যুদ্ধবিরতির খবর শুনে প্রেসিডেণ্ট নাসের আশ্বস্ত হলেন ঠিকই; কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাত্র দু'দিনের মধ্যে তিনি এতে সক্ষমও হলেন।

যুদ্ধবিরতির দিনই বাদশাহ হোসেন ফরাসী পত্রিকা 'লা মণ্ডে'র সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্বীকার করলেন যে, গেরিলাদের সামরিক বল সম্পর্কে জর্দানী গোয়েন্দা বিভাগ তাকে ভুল সংবাদ দিয়েছিল। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, বাদশাহর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিল প্যালেষ্টাইনী অথবা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

সাংবাদিক মাইকেল নিকলসন মাশের হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার সাদ মাশেরের সঙ্গে আলাপ করে জর্দানী সেনাদের অমানবিক ব্যবহারের এক দুঃখজনক অধ্যায়ের কথা জানতে পারলেন। ব্যথিত কণ্ঠে ডাঃ মাশের তাঁকে বললেন :

"আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, জর্দানী বাহিনী এ ধরণের দুর্ব্যবহার করতে পারে। দুটি সাঁজোয়া গাড়ী এবং কয়েকটি জীব নিয়ে ১৫ জন সৈন্য হাসপাতালে এসেছিল। তাদের সাঁজোয়া গাড়ীর মেশিনগানগুলো হাসপাতালের দিকে তাক করিয়ে রেখে সৈন্যরা ভেতরে প্রবেশ করলো।

একজন সাধারণ সৈন্য এসে হাসপাতালে তল্লাসী করার জন্য আমার কাছে দাবী জানালো। সে বললো যে আমরা কমাণ্ডোদের আশ্রয় দিয়েছি।

এরপর তারা প্রতিটি ওয়ার্ড তল্লাসী করলো। একটি দরজা খুলতে না পেরে তারা কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। লিফটের যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে ঢুকতে না পেরে সেখানে গ্রেনেড ফাটিয়ে তারা ঘরের সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। গুরুতররূপে আহত অবস্থায় কয়েকটি তরুণকে দেখতে পেয়ে তারা তাদেরকে জোর করে হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেল। এর মাত্র এক ঘণ্টা পরে তারা হাসপাতাল ভবনে শেল নিক্ষেপ এবং মেশিনগান থেকে গুলি নিক্ষেপ করতে লাগলো। ফলে আমাদের জেনারেটর নষ্ট হয়ে গেল যার জন্যে আমাদেরকে এখন মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়।

সন্ধ্যা ৮টা ৩০ মিনিটে প্রেসিডেণ্ট নিমেরী শান্তিমিশন নিয়ে কায়রো ফিরে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আসলেন আর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তবে তিনি কোন দেশের রাজা বা প্রেসিডেণ্ট জাতীয় কেউ নন। তিনি প্যালেষ্টাইনীদের প্রাণপ্রিয় নেতা ইয়াসির আরাফাত। সাংবাদিকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি 'নীল হিল্টন' হোটেলে উঠলেন।

হোটেলে তিনি যে অভ্যর্থনা এবং সুযোগ সুবিধা পেলেন তা কেবল কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হলেই পাওয়া যায়। সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সলের পাশের কক্ষেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হলো আর কক্ষটির নতুন করে নামকরণ করা হলো 'প্যালেষ্টাইন সুইট।'

রাত ১০টায় হোটেলের 'হাজার এবং এক রাত' নামের হল ঘরে আরব দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা এক আলোচনা সভায় মিলিত হলেন। ৪ ঘণ্টা স্থায়ী এই আলোচনায় শান্তি মিশনের সদস্যরা প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে তাঁদের আম্মান সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। তাদের প্রতি বাদশাহ হোসেনের ব্যবহার, গেরিলাদের সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এমনকি হাজার হাজার বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ প্রভৃতি ঘটনা শোনার পর উত্তেজিত প্রেসিডেণ্ট নাসের অত্যন্ত কড়াভাষায় এক টেলিগ্রাম পাঠালেন

বাদশাহ হোসেনের কাছে।

সকাল ১১টায় শান্তি মিশনের সদস্যরা জর্দানে অনুষ্ঠিত গণহত্যার বর্ণনা দেয়ার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করলেন। শান্তি মিশনে অধিকাংশ আরব দেশের প্রতিনিধি থাকায় জর্দানে অনুষ্ঠিত হত্যাযজ্ঞের উপর এই মিশনের মতামত সমগ্র আরব জগতের মতের প্রতিনিধিত্ব করছিলো। এতে দেখা যায় যে, প্রতিটি আরব দেশই এই গণহত্যার বিরোধিতা করেছে।

লম্বা বলিষ্ঠ গড়নের প্রেসিডেন্ট নিমেরীকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো যেন কোন প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়। শান্ত অথচ দৃঢ় বলার ভঙ্গির জন্য মনে হচ্ছিলো তিনি যা বলছেন তা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত—তাতে কোন অতিরঞ্জণ নেই। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে তাঁরা অধবিধ্বস্ত মিসরীয় দূতাবাসে ইয়াসির আরাফাতের সংঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন তা বলার-পর তিনি অভিযোগ করলেন যে, বাদশাহ হোসেন শান্তি মিশনের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইয়াসির আরাফাতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বললেন, জর্দানের গৃহযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ২৫ হাজার। জর্দানী বাহিনী গতকালের যুদ্ধবিরতি পরিপূর্ণভাবে পালন করেনি বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন। শান্তি মিশনের পক্ষ থেকে তিনি বললেন যে, বাদশাহ এবং তার সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা প্যালেষ্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলন ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর।

বেলা সাড়ে এগারোটায় আম্মান থেকে ৮ জন বৃটিশ, ৬ জন সুইস এবং ২ জন জার্মান জিম্মীকে মুক্তি দিয়ে সাইপ্রাসগামী একটি বিমানে তুলে দেয়া হলো। বিকেলের দিকে ২ জন মার্কিন ইহুদীসহ ৩২ জন মার্কিন জিম্মীকে মুক্তি দেয়া হলো।

জর্দান সংকটের শুরু থেকে প্রেসিডেন্ট নাসের দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন। অতিরিক্ত শ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পরায় বন্ধু হাসনায়েন হেইকল (আল-আহরাম পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক) তাঁকে স্মরণ

করিয়ে দিলেন যে, গত বছর তিনি হৃদপিণ্ডের অসুখে ভুগছিলেন। জবাবে প্রেসিডেণ্ট বললেন : "জর্দানে নারীপুরুষ শিশু মারা যাচ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাদের জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

বেলা সাড়ে এগারোটায় বাদশাহ হোসেন কায়রো পৌঁছলেন। বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন প্রেসিডেণ্ট নাসের। একমাস আগে কায়রো সফরের সময় অগণিত জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। কিন্তু আজ প্যালেষ্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলনের শত্রুকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ আসেনি।

দুপুর সাড়ে বারোটায় হিল্টন হোটেলে আরব নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন বসলো। সম্মেলন শুরু হওয়ার পর পরই ইয়াসির আরাফাত কয়েক মুহূর্তের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'দিকে দু'টি পিস্তল ঝোলানো, পরনে চিরাচরিত কাফিয়া আর বৈমানিকের সার্ট, চোখে পুরু গগলস। টেবিলের অপর ধারে বসে থাকা বাদশাহ হোসেন চোখ তুলে দেখে নিলেন গেরিলা নেতা কোথায় কিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে কেবলমাত্র আরাফাত এবং বাদশাহ হোসেন সশস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। ৬ ঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠকে ১৪ দফা শান্তিচুক্তি উত্থাপন করা হলো। জর্দান সরকার এবং পি, এল, ও,'র মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে প্রথমে বাদশাহ, পরে প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং সবশেষে ইয়াসির আরাফাত স্বাক্ষর করলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে অত্যন্ত আনন্দিত কিন্তু পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিলো।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দু কায়রো থেকে একে একে রাজনৈতিক নেতারা বিদায় নিলেন। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত-তৃপ্ত নাসের সবাইকে জানালেন বিদায় অভিনন্দন। নিজের অজান্তেই তিনি তাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন সেই সঙ্গে।

বেলা সাড়ে তিনটায় প্রেসিডেণ্ট নাসের বাড়ীতে পৌঁছে স্ত্রীকে জানালেন যে, তিনি পরিশ্রান্ত। তিনি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী চিন্তিত হয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে পাঠালেন।

ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল যে, রক্ত জমাট বেধে যাওয়ায় প্রেসিডেন্টের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। অবশেষে সন্ধ্যা সোয়া ৬ টায় ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে লক্ষ্য কোটি আত্মীয় পরিজন শুভাকাঙ্খীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট নাসের ইহলোক ত্যাগ করলেন।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হ'বার ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শোকার্ত জনতা রাস্তায় নেমে পড়লো। মিছিল করে এগিয়ে যেতে যেতে মরিয়া হয়ে তারা চীৎকার করছিলোঃ "নাসের মরেনি। নাসের মরতে পারে না।" ধীরে ধীরে প্রতিটি আরব দেশে একই দৃশ্যের স্থচনা হলো। কায়রো ত্যাগ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিভিন্ন আরব নেতা আবার ফিরে আসলেন মহান প্রেসিডেন্টের শেষকৃত্যে যোগদানের জন্য। তাদের সবার চোখে উদগত অশ্রু। রাশিয়ার প্রধান-মন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন অ-আরব রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে প্রথম কায়রো পৌঁছলেন। অশ্রু তাঁর চোখেও বাঁধা মানছে না।

আজ বিকেলে সর্বশেষ ৬ জন মার্কিন জিম্মীর সন্ধান পাওয়া গেল ইরবিদের এক বাঙ্কারে। জর্দানী বাহিনীর গোলা থেকে বাঁচবার জন্য গেরিলারা তাদেরকে এখানে রেখে দিয়েছিল। তাদের মুক্তি পাওয়ার পর-পরই লায়লা খালেদ এবং তাঁর অন্য ৬ জন সহযোদ্ধাকে মুক্তি দেয়া হবে।

তিনজন মার্কিন ইহুদীসহ জিম্মীদের শেষ দলটি মুক্তি পেয়ে সাইপ্রাস পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, জর্দান এবং সুইডিশ সরকার তাদের কথামত লায়লা খালেদ এবং অন্য ৬ জন গেরিলাকে মুক্তি দানে সিদ্ধান্ত নিলেন।

সকাল পৌনে সাতটায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে একটি কালো পুলিশ ভ্যান লায়লা খালেদকে নিয়ে ইলিং থানা থেকে যাত্রা করলো। এরপর একটি হেলিকপ্টারে করে তাঁকে আনা হলো বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর লিনেহাম ঘাঁটিতে। এখান থেকে মুক্ত লায়লা খালেদ একটি বিমানে করে কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

বিমান ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে পাইলট লায়লার কাছে এসে রসিকতা করে প্রশ্ন করলেনঃ "আশা করি আপনি এই বিমানটি ছিনতাই করবেন না। তাই না?" মৃদু হেসে প্যালেষ্টাইনী বীরাঙ্গনা জবাব দিলেনঃ "উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি এ বিমান ছিনতাই করবো না।" এরপর বিমানটি মিউনিক এবং জুরিখ থেকে বাকী ৬ জন গেরিলাকে নিয়ে কায়রোর পথে পাড়ি জমালো।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—